বড়দের স্মরণে

মাওলানা আসেম ওমর

মাওলানা আসেম ওমর

বড়দের স্মরণে

অনুবাদ

মাওলানা সানাউল্লাহ সিরাজী

আবাবিল প্রকাশন

১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

বড়দের স্মরণে
মাওলানা আসেম ওমর

প্রকাশনায়
আবাবিল প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ২০১৫

প্রচ্ছদ
হা-মীম কেফায়েত

মুদ্রণ : মাসুম আর্ট প্রেস
২৬/২ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ১২০ টাকা

ISBN : 984-70160-0113-7

BARODER SORONE : Mawlana Asem Omar, **Published by : ABABIL PROKASHON** : 11/1 Banglabazar, Dhaka-1100
First Edition : August 2015 © by the pablisher

Price : 120 Taka only

অভিব্যক্তি

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○

আর তোমরা হিম্মত হারিয়ো না এবং পেরেশান হয়ো না, তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন হও। *[আলে ইমরান ৩:১৩৯]*

ইতিহাস সাক্ষী, আফগান ভূমিতে বিশ্বের সুপার পাওয়ারগুলো নিজেদের সংখ্যাধিক্য, উন্নত যুদ্ধাস্ত্র, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ভরসা এবং শক্তির দাপটে বারবার হামলা করেছে। তারা নিজেদের সামনে আত্মমর্যাদাশীল আফগানদের মাথা ঝোঁকাতে চেয়েছে; কিন্তু প্রত্যেকবার আত্মমর্যাদাশীল আফগান মুসলমানরা যুগের ফেরাউনদের নিজেদের ইমান, ধৈর্য, সাহসিকতা ও কৌশলের সঙ্গে টুকরা টুকরা করেছে। প্রতিবারই আফগান ভূ-খণ্ডকে আত্মমর্যাদাশীল আফগান মুসলমানরা সুপার পাওয়ারদের কবরস্থান প্রমাণ করে ছেড়েছে।

বর্তমান সময়ে দাজ্জালি ফেতনা সবচেয়ে বড় ফেতনা। এমন সময় বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার মাওলানা আসেম ওমর খুবই পরিচিত একটি নাম। এর আগে আমরা তাঁর বেশ কয়েকটি বই অনুবাদ করে বাজারে দিয়েছি, যা পাঠকমহলে বেশ আশার খোরাক জুগিয়েছে। বিশেষত ইমাম মাহদির শত্রু-মিত্র বইটি। এ বইটি পড়ে অনেক জায়গা থেকে ফোন আসে যে এখানে বড়দের নিয়ে যে অধ্যায় তৈরি হয়েছে তা আলাদাভাবে বই করার জন্য। মূলত সেই ভাবনা থেকেই এটি রচিত। তবে পাঠকদের সুবিদার্থে এবং বিষয়ের সঙ্গে মিল রেখে তাঁর অন্য আরো কিছু বই থেকে স্থানে স্থানে সংযোজন করা হয়েছে। সঙ্গে ওই বিষয়ের সঙ্গে মিল রেখে ইন্টারনেট থেকে বেশ কিছু হাদিস এবং তত্ত্ব ও তথ্যবহুল কিছু চুম্বক অংশ এখানে তুলে দেওয়া হয়েছে, যা বিজ্ঞ পাঠকমহল পড়লেই বুঝতে পারবে। আশা করি বইটি তাঁর অন্যসব বইয়ের মতোই সবার উপকারে আসবে। আর তখনই শ্রম সার্থক হবে, যখন ভুলগুলো ধরিয়ে দিয়ে আগামী দিনের পথ চলায় আপনিও সঙ্গী হবেন। আল্লাহ সবাইকে কবুল করুন, আমিন!

তোহফা

ইমামে ওয়াক্ত
গাজী আব্দুর রশীদ শহীদ রহ.
ও
লাল মসজিদের সেসব আত্মসম্মান বোধসম্পন্ন
ছাত্রীর নামে যাঁরা পুরুষদের পক্ষ থেকে
কুরবানি দিয়ে দীনি স্বকীয়তার মান রেখেছেন এবং
হকপন্থীদের ইতিহাসকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।

– মাওলানা আসেম ওমর

সূচিপত্র

ইসলামী ইতিহাস এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস / ১১
বিজয়ী থাকায় আমাদের উদ্দেশ্য / ১৫
বড়দের স্মরণে / ১৬
হাসান বসরী রহ. : সত্যবাদিতা ও নির্ভীকতা / ২০
ইমাম আবু হানিফা রহ. / ২২
ইলমী মর্যাদা / ২২
তাকওয়া / ২৩
কারাগারে ইমামে আজম রহ.-এর ওপর নির্যাতন / ২৪
ইমাম সাহেব রহ.-এর জানাজা জেল থেকে বের হয়েছে / ২৫
ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. / ২৭
ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. এবং খলকে কুরআনের ফেতনা / ২৭
ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের হাত কেটে ফেলো / ৩০
অতীত আমাদের আয়না / ৩২
শায়খ আবদুল কাদির জিলানী রহ. / ৩৪
শায়খ আবদুল কাদির জিলানী রহ. এবং সত্যবাদিতা / ৩৫
সালাহ্ উদ্দীন আইয়ুবী রহ. / ৩৬
হাত্তিনের যুদ্ধ চূড়ান্ত যুদ্ধ / ৩৯
মক্কা-মদিনার ওপর কুদৃষ্টিদাতার পরিণাম / ৪০
বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় / ৪১
সম্মিলিত সেনাদল ও ইসলামের সিংহ সুলতান
সালাহউদ্দীন আইয়ুবী রহ. / ৪২
হজরত নূহ (আ.)-এর ওপর ঈমান ও
তাঁর নৌকায় আরোহণকারী সম্প্রদায় / ৪৪
বস্তুবাদী নমরুদ ও আমাদের জাতির পিতা হজরত ইবরাহিম (আ.) / ৪৭
মাথা বড় আবু জাহেল / ৪৭
সিলা পর্বত / ৪৯
ওসমানি খেলাফতের শেষ সময়গুলো / ৫১
হজরত আবদুল্লাহ জুলবাজ্জাদাইন রা. / ৫৪

হজরত খুবাইব রা. / ৫৫
সাইয়েদ কুতুব শহীদ (রহ.) / ৫৭
মোল্লা ইয়ার মুহাম্মদ আখুন্দ / ৬৪
দুশমনের হাতে প্রথম গ্রেপ্তারি ও মুক্তি / ৬৪
দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার ও মুক্তি / ৬৫
বসন্ত যখন নওবসন্ত হয় / ৬৫
শাহাদাতবরণ / ৬৬
প্রচারমাধ্যম / ৬৬
দুনিয়ার দৌলতকে পদাঘাতকারী মূর্তিহন্তা তালেবান / ৬৮
আফগান জিহাদের উজ্জ্বল সেতারা : মোল্লা সাইফুর রহমান / ৭০
শরিয়তের পাবন্দি / ৭৬
জিহাদের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক / ৭৬
শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা / ৭৭
মাওলানা আবদুল হান্নান জিহাদওয়াল শহীদ রহ. / ৭৮
শহীদ হাফেজ বদরুদ্দীন হক্কানী (রহ.) / ৭৯
কুফরকে তছনছকারী ফেদায়ি হামলা / ৮০
যে কারণে দাজ্জালি শক্তিগুলো মুজাহিদদের শত্রু / ৮১
আমরা কী চাই, আর দাজ্জাল কী চায় / ৮৪
আবদুল্লাহ ইউসুফ আজ্জাম (রহ.) / ৮৮
এই সেই কিশোর / ৯০
মুসলমানরা লাঞ্ছিত হওয়ার কারণ ইতিহাস থেকে
শিক্ষা না নেওয়া / ৯১
যার একটি উদাহরণ মোল্লা ওমর / ৯৪
হযরত দাউদ আ. / ৯৮
একটি ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্র ও
আমর ইবনে উমাইয়া দিমারির রা.-এর অভিযান / ১০৩
পূর্ব থেকে কালো পতাকার আগমন ও তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় / ১০৭
কালো পতাকার ভবিষ্যদ্বাণী / ১০৮
ইসলামে কালো পতাকাবাহী সেনাবাহিনীর বর্ণনা / ১০৮
মহানবী সা.-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী ও
স্বপ্ন ব্যাখ্যায় হযরত ইউসুফ (আ.) / ১১০
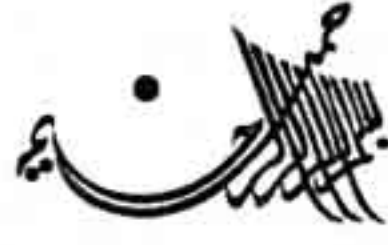
ইসলামী ইতিহাস
এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস

পৃথিবীর জাতিগুলোর মধ্যে মুসলমানই একমাত্র জাতি, যার রয়েছে সর্বাধিক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস-ঐতিহ্য। যে জাতি তাদের মহৎ ব্যক্তিদের কীর্তিগুলো সম্পর্কে এমনই নিশ্চিতভাবে জানতে পারে, যা সর্ব প্রকার সংশয় ও সন্দেহ থেকে মুক্ত। মুসলমানদের হোমায়ের এলিড অথবা হিন্দুদের রামায়ণ, মহাভারতের কল্পকাহিনীর প্রয়োজন নেই। কেননা এসব কল্পকাহিনীর চেয়ে অনেক বেশি বিস্ময়কর ও গৌরবোজ্জ্বল কাহিনীর বাস্তব উদাহরণ তাদের ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে। অথচ ওই সব কল্পকাহিনীর মিথ্যাচারিতা ও অবিশ্বস্ততার ছোঁয়াও তাতে লাগেনি। মুসলমানদের ফেরদৌসীর শাহনামা অথবা স্পর্টাবাসীর কল্পকাহিনীরও কোনোই প্রয়োজন নেই। কেননা, তাদের ইতিহাসের পাতায় পাতায় রুস্তম ও স্পার্টার ছড়াছড়ি রয়েছে। মুসলমানদের ন্যায়পরায়ণ নওশেরওয়া বাদশাহ বা হাতেম তাঈর গল্পেরও কোনোই প্রয়োজন নেই। কেননা, তাদের সত্য ইতিহাসের পাতায় পাতায় অসংখ্য হাতেম ও নওশেরওয়া বিদ্যমান। মুসলমানদের এরিস্টোটল, বেকন, বাতলামুস বা নিউটনেরও কোনোই প্রয়োজন নেই। কেননা, তাদের পূর্বপুরুষদের মজলিসে এমন সব দার্শনিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী মওজুদ রয়েছেন, যাঁদের পাদুকাবাহনকেও উল্লিখিত যশস্বী লোকেরা গৌরবান্বিতবোধ করবেন।

আজ বড়ই আফসোস ও বিস্ময়ের বিষয় হলো, যখন বিশ্বের তাগুত শক্তি নিজেদের বিশ্বদরবারে সমুন্নত করার প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত, তখনো সর্বাধিক ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস-ঐতিহ্যের অধিকারী মুসলমানরা নিজেদের ইতিহাস সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন ও নির্বিকার। কিন্তু এর কারণ কী? এর কারণ মুসলমানদের যে শ্রেণীটাকে আজ শিক্ষিত ও সচেতন মনে করা হয়, তারাও তাদের বক্তৃতা-বিবৃতি ও প্রবন্ধাদিতে কোনো মহৎ ঘটনার উদাহরণ দিতে চান

তখন মনের অজান্তেই তাঁদের মুখ ও কলম দিয়েও কোনো ইউরোপিয়ান বা খ্রিস্টান মনীষীর নামই নির্দ্বিধায় বেরিয়ে আসে। এ ক্ষেত্রে তার চেয়েও হাজার গুণ উল্লেখযোগ্য কোনো মুসলিম মনীষীর নাম তাঁর জানা থাকে না। এ সত্যকে কে অস্বীকার করতে পারে যে মুসলমানদের শিক্ষিত শ্রেণী বিশেষত, নব্য শিক্ষিত শ্রেণীর মুসলমানদের বক্তৃতা-বিবৃতি বা রচনাদিতে নেপোলিয়ন, হ্যানিবল, শেক্সপিয়ার, বেকন, নিউটন প্রমুখ ইউরোপীয় মনীষীর নাম যত নিতে দেখি; খালিদ বিন ওয়ালীদ, সালাহউদ্দীন আইয়ুবী, হাসসান ইবনে ছাবিত, ফেরদৌসি, তূসী, ইবনে রুশদ, বু-আলী, ইবনে সীনা প্রমুখ মুসলিম মনীষীর নাম তত নিতে দেখা যায় না। এর একটি মাত্র কারণ, আর তা হচ্ছে বর্তমান যুগে মুসলমানরা তাদের নিজ ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ ও নির্বিকার। মুসলমানদের এই অজ্ঞতা ও উদাসীনতার মধ্যে অনেক কারণ রয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ হলো–

১. পৃথিবীর অন্যান্য জাতির তুলনায় মুসলমানদের জ্ঞানস্পৃহা কম।

২. পর্যাপ্ত পরিমাণে জ্ঞানান্বেষণের ওই রকম সুযোগ-সুবিধাও মুসলমানদের মাঝে নেই।

৩. সরকারি কলেজ ও মাদ্রাসাগুলো ইসলামী শিক্ষায়তনগুলোকে ভারতবর্ষে প্রায় অস্তিত্বহীন করে দিয়েছে।

৪. মুসলমানদের যে শ্রেণীটিকে সাধারণত শিক্ষিত বলা হয়ে থাকে এবং মুসলমানদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় বলে গণ্য করা হয়, তাদের প্রায় সবাই সরকারি শিক্ষায়তনগুলোতে লেখাপড়া করে এসেছেন, যেগুলোতে ইসলামের ইতিহাস পাঠ্যভুক্ত নয়, আর তা পাঠ্যভুক্ত থাকলেও ইসলামের ইতিহাস পদবাচ্য নয়। অন্য কিছু অথচ এটাকেই ইসলামের ইতিহাস বলে আখ্যায়িত করা হয়। কলেজ থেকে ডিপ্লোমা হাসিল করার পর না জ্ঞানার্জনের বয়স বাকি থাকে, আর না তার তেমন কোনো অবকাশ বা সুযোগ থাকে। মোটকথা আমাদের শিক্ষিত মুসলমানদের সেই ইসলামের ইতিহাসের ওপরই নির্ভর করতে হয়, যা ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রুরা ইতিহাসকে বিকৃত করে তাদের ইংরেজি পুস্তকাদিতে লিখেছে। মুসলমানদের আহে পৃথিবীর অন্য কোনো জাতির এ সৌভাগ্য হয়নি যে ইতিহাসকে একটা সঠিক ভিত্তির ওপর রীতিমতো একটা শাস্ত্ররূপে দাঁড় করাবে। তাঁদের কেউ-ই তাদের পূর্বপুরুষদের সঠিক ইতিহাস রচনায় সমর্থ হয়নি, আর হবেও না। মুসলমানদের ইতিহাসই সত্য ও সত্যনির্ভর ইতিহাস, যা তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া দরকার মুসলমান কিসের জাতি, কোথায় তাদের গোড়া। যদি তাদের সত্য চোখ থাকত, তবে তারা আজ

মুসলমানদের এ সত্য ইতিহাসকে মিথ্যার চাদর দিয়ে ঢেকে দিত না। *[মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী রচিত 'তারীখে ইসলাম' খণ্ড : ১ম, পৃ. ২৫]*

ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز

چراغِ مصطفوی سے شرارِ بولہبی

যুদ্ধ রয়েছে শুরু থেকে আজ পর্যন্ত
মুহাম্মদী চেরাগের সঙ্গে লাহাবী চক্রান্ত।

ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদি চক্রান্ত নিশ্চয় খুবই বিপজ্জনক ছিল। পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্ম তাদের এক অংশও বরদাশত করত না। খ্রিস্টানদেরই নেওয়া যাক, সেন্ট পৌলের একটিমাত্র স্বপ্নই গোটা খ্রিস্টান জগৎকে মূল থেকে উপড়ে ফেলেছিল। অথচ ইসলামী বিশ্বের বিরুদ্ধে সংঘটিত চক্রান্তগুলো চূড়ান্ত পর্যায়ের ধ্বংসাত্মক ও বিধ্বংসী ছিল। ধাপে ধাপে, পূর্ণ গোপনীয়তার ভারী পর্দার আড়ালে, মিথ্যা ও চক্রান্তের জুব্বা পরে, চেহারায় নিষ্পাপ হওয়ার কৃত্রিম ছাপ ফেলে, দীনে হানিফের অস্তিত্বের ওপর ধারাবাহিক আক্রমণ করে আসছে। তাদের বিস্তৃতি ও গভীরতা এ বিষয়ের ওপর লিখিত বড় বড় কিতাব থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে ইসলামের দুশমনরা বংশপরম্পরায় চেষ্টা করে আসছে। নিজেদের শয়তানি মিশনের জন্য দিন-রাত এক করে ফেলেছে, কিন্তু তাদের জিন্দেগি গাদ্দারি, চক্রান্ত, চুক্তি ভঙ্গ ও ধোঁকাবাজিতে ভরপুর। তাদের কুরবানি ইহুদি বিশ্বকে নিশ্চয়ই অনেক সফলতা এনে দিয়েছে। কিন্তু নেতৃত্বের দুর্বলতা, চারিত্রিক অধঃপতন ও শয়তানি মিশন তাদের ইতিহাসকে এত কলুষিত করেছে যে এর দুর্গন্ধে গোটা পৃথিবী তাদের ঘৃণা করছে।

পক্ষান্তরে তাদের মোকাবিলায় মুহাম্মদে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ও সত্যপন্থি উম্মতগণ চুক্তি-কৃতজ্ঞতা, আমানত-সত্যবাদিতা ও মানবতার এমন ইতিহাস রচনা করে গেছেন যে এর ওপর শুধু মুসলমানই নয়; বরং গোটা মানবজাতি গর্ব করতে পারে। তাদের নেতৃত্বের সামর্থ্য, উন্নত চরিত্র, মানবতার সফলতা ও কামিয়াবির মিশন তাদের জীবনকে এত সুগন্ধিময় করেছে যে অনুভূতিশীলরা আজও তা অনুভব করছে। যেখানেই সফলতা ও ব্যর্থতা, সেখানেই আল্লাহওয়ালাগণ শয়তানের বাহিনীর ওপর বিজয়ী থাকেন। যদিও সাময়িক সফলতা শয়তানের বাহিনীর অর্জন হচ্ছে, কিন্তু তারা তাদের মূল টার্গেট অর্জনে ব্যর্থ হবে।

এই দীন আপন অবস্থায় বাকি থাকাটাই তা হক ও সত্য হওয়ার প্রমাণ বহন করে। যেহেতু রাসুল সা.-এর পর কোনো নবী আসবে না, তাই আল্লাহ তায়ালা এই দীনকে আসল অবস্থার ওপর বাকি রাখার ব্যবস্থা করেছেন। দুশমনী শক্তিগুলোর আক্রমণ থেকে ইসলামের প্রতিরক্ষার জন্য আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ ফরজ রাখার ব্যবস্থা করেছেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই দীনের ওপর নিপতিত ধুলাবালি পরিষ্কার করে তার চেহারা চমকানোর জন্য ব্যবস্থা করেছেন। প্রত্যেক শতাব্দীর শুরুতে একজন মুজাদ্দিদ হবেন, যিনি এই দীনকে শিরক-বেদাত ও কুপ্রথা-কুসংস্কার থেকে পবিত্র করে সেই অবস্থায় ফিরিয়ে আনবেন, যার ওপর নাবিয়ে আখিরুজ-জামান সা. রেখে গেছেন।

এই দীনকে সেই আসল অবস্থার ওপর বাকি রাখার জন্য প্রত্যেক যুগে এমন একটি জামাত বিদ্যমান থাকবে, যারা এই সত্যের জন্য নিজেদের জান কুরবানি দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না। হককে বাঁচানোর জন্য তাদের জীবন দিতে হলে জীবন দেবে এবং জীবন দিয়ে মুসলমানদের এই পয়গাম দেবে যে হক কী জিনিস? যথা—হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে,

عن جابر بن عبدالله يقول سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه و سلم فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة

জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা. বলেন, আমি নবী কারিম সা.কে বলতে শুনেছি; আমার উম্মতের একটি জামাত হকের জন্য যুদ্ধ করতে থাকবে। তারা কেয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী থাকবে। যখন ঈসা বিন মরইয়াম আ. আগমন করবেন, তখন মুসলমানদের আমির বলবেন, আসুন, আমাদের নামাজের ইমামতি করুন। ঈসা বিন মরইয়াম আ. বলবেন, না, তোমরাই একে অপরের ইমামতি করো। এই উম্মতকে আল্লাহ তায়ালা সম্মানিত করেছেন। *[সহিহ মুসলিম শরিফ।]*

পরের বর্ণনায় এসেছে—

عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تزال طائفة من امتى يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال.

ইমরান বিন হাসিন রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেন, আমার উম্মতের একটি দল হকের জন্য কিতাল করতে থাকবে। যে তাদের বিরোধিতা করবে, তারা তার ওপর বিজয়ী হবে। এমনকি তাদের শেষ দলটি দাজ্জালের সঙ্গে কিতাল করবে। *[আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ, মুসতাদরাকে হাকিম; তিনি বলেন এটি ইমাম মুসলিম রহ.-এর শর্ত অনুযায়ী সহিহ, ইমাম যাহাবি রহ. তালখিসে এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন।]*

হজরত ইমাম হাকেম রহ.ও আলোচ্য অভিমতের সমর্থনে এটি বর্ণনা করে বলেন–

عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا هلك اهل الشام فلا خير فى امتى. ولا تزال طائفة من امتى يقاتلون على الحق ظاهرين لا يبالون من خالفهم أوخذلان من خذلهم حتى يأتى امر الله.

আবদুল্লাহ বিন উমর রা. রাসুল সা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল সা. এরশাদ করেন, যখন শামবাসী ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন আমার উম্মতের মধ্যে কল্যাণ থাকবে না। আমার উম্মতের একটি দল হকের জন্য কিতাল করতে থাকবে। তারা বিজয়ী থাকবে। তারা বিরোধীদেরও পরোয়া করবে না, পক্ষপাতিত্বেরও পরোয়া করবে না। এমনকি তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে হুকুম (কিয়ামত) আসা পর্যন্ত সেই অবস্থায়ই থাকবে। *[কানজুল উম্মাল; হাদিস নম্বর ৮৩২৩৩, ইবনে আসাকির।]*

বিজয়ী থাকায় আমাদের উদ্দেশ্য

এই হাদিসগুলোতে কিয়ামত পর্যন্ত কিতালকারী দলের ব্যাপারে নবুওয়তি জবানে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছে, তারা বিরোধীদের ওপর বিজয়ী থাকবে। এই বিজয়ী থাকার উদ্দেশ্য কি প্রকাশ্যে বিজয়ী থাকা? নাকি কিতালের মধ্যে বিজয়ী থাকা? না অন্য কিছু?

এই বিজয়ী থাকার উদ্দেশ্য হলো, তারা যেই হকের জন্য কিতাল করবে, সেই হককে সর্বাবস্থায় বাঁচিয়ে রাখা হবে। হতে পারে এতে তাদের প্রকাশ্য বিজয়ও মিলে যাবে। কিন্তু যদি প্রকাশ্যে কিতালের ময়দানে বিজয়ী না হতে পারে; বরং সবাই শহীদ হয়ে যায় তাহলেও তারা তাদের দুশমনদের ওপর বিজয়ী থাকবে। তারা যেই হকের জন্য দাঁড়িয়েছিল, তাকে হক প্রমাণিত করা হবে। তারা থাকা অবস্থায় তাদের দুশমন বাতিলকে হক হিসেবে প্রমাণ করতে পারবে না। যেমনভাবে অন্যান্য দীনের সঙ্গে করা হয়েছে। এই পাগলের দল বাতিলের তুফানের সামনে সিনা টান করে দাঁড়িয়ে যাবে এবং তুফানের দিক পাল্ট দেবে। কখনো বেঁচেও যেতে পারে। তবে ডুবে গেলেও বাতিলের তুফানকে হক পর্যন্ত পৌঁছতে দেবে না। এ ধরনের পাগলদের ব্যাপারেই কবি বলেছেন–

ہم کیسے تیراک رہے ہیں پوچھو ساحل والوں سے

خود تو ڈوب گئے لیکن رخ موڑ دیا طوفانوں کا

তীরবাসীকে জিজ্ঞেস করো, আমরা কিভাবে সাঁতার কাটছি
নিজেরা তো ডুবে গেছি; কিন্তু তুফানের গতি পাল্টে দিয়েছি।

সুতরাং আপনি দেখে থাকবেন, এই পাগলগুলো ইসলামী ইতিহাসের দিগন্তে ঝলমলে নক্ষত্রের মতো চমকাচ্ছে। এদিকে ডুবে গেলে ওদিকে বের হয়ে আসছে, ওদিকে ডুবে গেলে এদিকে বের হয়ে আসছে। আজও এই ধারা চলমান রয়েছে। এমনই পবিত্র আত্মার কারণে ইসলামী ইতিহাস রোশনি ছড়াচ্ছে, যারা কলিজার খুন ঢেলে এই বরকতময় বৃক্ষের প্রতিপালন করছে। মুসলিম সমাজে মন্দাচার থাকা সত্ত্বেও ইসলামের আসল অবয়ব পরিচ্ছন্ন এবং পবিত্র। একের পর এক হামলা, অভ্যন্তরীণ ও বহিরাক্রমণ, ইসলামের জুব্বা পরিহিত মুনাফিকদের মুনাফেকি সত্ত্বেও চৌদ্দশত বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও পূর্ণিমার চাঁদের মতো ঝলমল করছে।

বড়দের স্মরণে

বর্তমানে যখন দুঃসময়ের শীতলতা হাড় পর্যন্ত পৌঁছছে, মাসলাহাতের কেবল চাদরই নয়, কম্বল ওড়ানো সত্ত্বেও দেহে কম্পন অনুভূত হচ্ছে, আগত সমীরণের প্রত্যেক দমকা শিরা-উপশিরায় বহমান খুনের প্রবাহকে ধীর করে দিচ্ছে, আশপাশের মানুষ, পরিবেশ অপরিচিত লাগছে, কোনো মানুষজনের আওয়াজই শোনা যাচ্ছে না, কখনো নিজের আওয়াজ এলেও পরতে পরতে মাসলাহাতের

চাদরে আবৃত থাকায় বিষয়বস্তু বোঝা মুশকিল হচ্ছে–এ অবস্থায় মন চাচ্ছে অন্ত রগুলোকে বড়দের স্মরণের মাধ্যমে উত্তপ্ত করি। অতীতের স্বল্প স্মরণে আল্লাহ না করুন আবার যেন উত্তপ্ত করতে গিয়ে জমে না যায়। আজ সেসব পবিত্র আত্মার আলোচনা হয়ে যাক, যারা আঁধার রাতে নিজেদের চাহিদা, আশা, আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের মশাল জ্বালিয়ে কাফেলায়ে মুহাম্মদী সা.-এর পথ প্রদর্শন করছে। আঁধার ঘোরতর হচ্ছে, মশাল টিম টিম করে জ্বলছে, তারা নিজের খুন তাতে ঢালতে শুরু করেছে। তার আলোকে নিভে যেতে দেয়নি। ফোঁটা ফোঁটা খুন তাতে নিংড়িয়ে দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত কলিজার খুনটুকুও সেই মশালে কুরবান করে গেছে। সেসব অমর ব্যক্তিত্বের স্মরণ করব, যাদের আলোচনা দিলওয়ালাদের দুনিয়ায় উদ্যমতা সৃষ্টি করে। হতে পারে আজ পুনরায় তাদের আলোকিত ইতিহাস পড়ে সেই দৃঢ় সংকল্পের পথে কদম রাখবে। যেসব লোক ভয়ে ভয়ে, চুপি চুপি ছোট ছোট নিঃশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছে, তাদের মনে পড়ে যাবে বড়রা কিভাবে জিন্দেগি যাপন করেছে। বাতিলের সঙ্গে কেমন আচরণ করেছে। এই আলোচনা তাদের জন্যও, যারা এই দৃঢ়সংকল্পের পথে পা রেখেছে, কিন্তু পেছনে ফিরে দেখছে গোটা উম্মত একদিকে দাঁড়ানো, আর আপনি অন্য দিকে। তাদের অন্তর শক্তিশালী হবে। হক পথের মুসাফিরদের জানা হবে, দৃঢ়সংকল্পের পথের পথিকদের ইতিহাস কেমন উজ্জ্বল, ঘোর আঁধারও আলোকিত হওয়ার জন্য তাদের থেকে আলো ধার নিতে চায়। গোলামদের জন্য আজাদির সবক এই মকতবেই পাওয়া যায়। আর আজাদিপ্রিয়দের মাথা না ঝোঁকানোর দিল এসব পবিত্র আত্মা থেকেই মিলে। এসব বুজুর্গ অমর ব্যক্তিত্ব মুহাম্মদ সা.-এর মুজেজার অন্তর্ভুক্ত। যারা একেক সময় একাই দুনিয়ার তামাম শয়তানি শক্তির মোকাবিলা করেছেন। দীনে হানিফকে এমন অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যে অবস্থায় নবীয়ে আখিরুজ্জামান আপন উম্মতকে রেখে গেছেন। রাসুল সা.-এর নাতিরা বাতিলের সামনে মাথা না ঝোঁকানোর এমন কিছু নিয়মনীতি রেখে গেছেন, রাসুলের প্রেমিকরা কখনো এ ব্যাপারে আকল ও যুক্তির কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপই করবে না। ফলে কাউকে শুধু একটি ফিকহি মাসআলার জন্য চাবুকের প্রহারের নিচে রাখা হয়েছে। কেউ কেউ বর্তমানের প্রশাসকদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মানদের সহযোগিতা করে জেল-জুলুমের নির্যাতনকে নিজের জন্য পছন্দ করে নিয়েছেন এবং বন্দিদশায় থেকেই জান্নাতের নাজ নেয়ামতের দিকে উড়ে গেছেন। কাউকে উম্মতের আকিদার হেফাজতের জন্য গায়ের চামড়া তোলা হয়েছে। কেউ কেউ খিঞ্জিরের ঠোঁটের দিকে নাচতে নাচতে ওপরের দিকে উড়ে গেছেন। কেউ অঙ্গার হয়েছেন, কেউ উত্তপ্ত শলায় বিদ্ধ হয়েছেন, কেউ লোহা ও তামার খোলে জীবিত সেলাই হয়েছেন। কেউ

শহর ছেড়ে পাহাড়, নদী-নালা ও মরুভূমিকে নিজের খুনে রঞ্জিত করেছেন। এক শায়খ নিজের সব মুরিদ ও সব কিছু নিয়ে দুনিয়ার সেই শক্তির সামনে দাঁড়িয়েছেন, যার রাজত্বে সূর্য অস্ত যায় না। মুরিদরাও কেমন? যাদের ছাড়া এই উপমহাদেশ এলেমের ক্ষেত্রে এতিম থেকে যেত। মাদ্রাসা ও খানকা থেকে উঠে ময়দানে জিহাদে বের হয়ে আকস্মিক গর্জে ওঠেন। আকাশের বাতাস বন্ধ হয়ে আসে। বিশ্ব স্থির হয়ে যায়। যদি এই বাহিনী শহিদ হয়ে যায়, তাহলে এই উপমহাদেশে কারা দীন শেখাবে? তাফসির, হাদিস, ফেকাহ ও ফতোয়া কে শেখাবে? কেউ একজন মেহমানের জন্য মুকুট, রাজত্ব, বাদশাহীকে লাথি মেরে প্রাণহীন পাহাড়ের অবলতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কেউ রাজপুত্রের জিন্দেগি ছেড়ে দারিদ্র্য বেছে নিয়েছেন। এসব পবিত্র আত্মার দল ও কারবালার ময়দানের দল পৃথক। কিন্তু একটি ব্যাপারে তারা এক। আর তা হলো, হক বলতে ও হকের ওপর আমল করতে কারো ভয়ের পরোয়া না করা। বাতিলকে বাতিল বলতে কোনো মাসলাহাতকে কাছে ভিড়তে না দেওয়া। নিজের চাওয়া-পাওয়া চাই–দীনি হোক অথবা দুনিয়াবি হোক, তার ওপর আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়া। আল্লাহর সন্তুষ্টি যখন সারা রাত হাদিস পড়ানোয় থাকত, তখন চোখ বন্ধ করা ছাড়া কালাল্লাহু ও কালার রাসুল বলে ইবলিস ও শয়তানের অন্তরে আঘাত করতে থাকত। যখন আল্লাহর সন্তুষ্টি পড়ানো ছেড়ে জেল-জুলুমের কষ্ট সহ্য করার মধ্যে, বিষ পান করার মধ্যে অথবা ঘরের দরজায় চুমো দেওয়ার মধ্যে, তখন আগে অগ্রসর হয়ে সেই সন্তুষ্টি অর্জনে লিপ্ত হতেন। ফেকাহ পড়াতে থাকেন, কুরআন-হাদিস থেকে মাসআলা বের করতে থাকেন, কিন্তু এই ফেকাহকে কেবল কিতাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং দেহের চামড়া বিসর্জনের বিনিময়ে সেসব মাসায়েলের ওপর আমল করার পদ্ধতি নিজের অনুসারীদের বুঝিয়ে গেছেন। আল্লাহওয়ালা ছিলেন, আল্লাহর বান্দারা আসা-যাওয়া করত না। বিরান অন্তরসমূহে আল্লাহর জিকির দ্বারা আবাদ করতেন। অন্তরের কুঠরীগুলোতে লুকিয়ে থাকা দুনিয়ার মহব্বত এভাবে আচড়ে বের করতেন যে বান্দা আখিরাতের চিন্তার মধ্যেই ডুবে থাকত। বক্ষসমূহকে গায়রুল্লার মহব্বত থেকে পবিত্র করে তাতে তাওহিদের আমানত ভরে দিতেন। ফলে বান্দা কেবল তার প্রতিপালকের জন্যই হতে থাকে। মহব্বতের সাগরে মাহবুবে হাকিকীর (আল্লাহ তায়ালা) সাক্ষাৎ লাভের আশা এমনভাবে উছলাতে থাকে যে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় প্রিয়ের দুশমনদের কাতার ভাঙতেই থাকে। সেই খানকাগুলোতে বসবাসকারীদের বীরত্ব এবং বাহাদুরী এমন পর্যায়ের হতো, সমকালীন প্রশাসকরা অনুগত হয়ে যেত। প্রশাসকদের কল্যাণের আদেশ ও

অকল্যাণ থেকে বাঁচাতে কখনো মাসলাহাতকে হেকমতের চাদর হিসেবে ব্যবহার করতেন না; বরং অমুখাপেক্ষী ভঙ্গিতে হক কথা বলে যেতেন।

طوفان یہاں تھم جاتے ہیں کہسار یہاں دب جاتے ہیں
اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں

এখানে তুফান থেমে যায়, পর্বত দেবে যায়
ফকিরি কুঠিরের সামনে শাহী বালাখানা ঝুঁকে যায়।

দৃঢ়সংকল্প পথিকের আলোচনা এখানে এ জন্যও উপযোগী যে ইমাম মাহদীর বন্ধু সেসব সাহসী নওজোয়ানই হতে পারবে, যারা দৃঢ়সংকল্পের কাঁটাঘেরা ও বরফের রাস্তার পথিক হবে। দীনে হকের জন্য তারা নিজ নিজ অবস্থানে থেকে জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর চলে হলেও দীনের হক আদায় করবে। ইমাম মাহদীকে পাওয়ার জন্য এবং কাফেলায়ে হকের সঙ্গে শামিল হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় অজানা খুনের দরিয়া এবং অশ্রুর সমুদ্র পাড়ি দেবে।

বড়দের ইতিহাস পড়ুন এবং আপনার বর্তমান যমানার প্রতি লক্ষ করুন। ফেতনা, চক্রান্ত এবং দুশমনদের আক্রমণের কঠোরতা দেখুন। বড় বড় স্তম্ভ ভিত্তিসহ উড়ে যায়। সাধারণ মশালের কী অবস্থা? এবারের তুফানে আলোর সুউচ্চ মিনারকেও বয়োবৃদ্ধ টিমটিম চেরাগের মতো মনে হচ্ছে। অনাড়ি অনভিজ্ঞ মাঝির কথা কী বলব? বিশ্ব ভ্রমণকারী, দুনিয়াজুড়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মাঝিও দাঁড়-বৈঠা ছেড়ে তুফান থামার অপেক্ষা করছে। এমন সময় কিছু পাগল আছে, যারা পণ করেছে; এই তুফানের বুকের ওপর সওয়ার হয়ে মনজিলে পৌঁছে যাবে। যারা এই কথাকে রপ্ত করেছে, নবুওয়াতের মশাল পর্যন্ত কোনো অবাধ্য তুফানকে পৌঁছতে দেবে না। তাদের অন্তরে এই এরাদা বসিয়ে নিয়েছে; বাতিলের উছলে ওঠা তুফানের সঙ্গে লড়ে গতি পরিবর্তন করে দেবে, যদিও নিজেরা ডুবে যায়। আহলে হকের কাফেলার এই আল্লাহওয়ালারা ইসলামের মশালের হেফাজতের জন্য রাতভর তার আলোকে তাদের 'আহ' ধ্বনি এবং ডুকরে ওঠা কান্না দিয়ে প্রজ্জ্বলিত করছেন। আঁধার যখন বাড়তে থাকে, অন্ধকার যখন গাঢ় হতে থাকে, তখন তারা তাদের চাওয়া-পাওয়া তাতে বিসর্জন দিয়ে তার আলো বাড়াতে থাকেন। আজ উম্মতের অভিধানে আত্মমর্যাদাবোধ, লজ্জা, সত্যবাদিতা, কৃতজ্ঞতা, অগ্রাধিকার, ত্যাগ প্রভৃতি শব্দগুলো তাদের কারণেই টিকে আছে। এসব কিছু অল্প বয়সের, নাকি যৌবন কালের, নাকি পরন্ত যৌবনের? কার জন্য? সবাই ভিন্ন ভিন্ন ভূখণ্ড থেকে এসেছেন। না তাদের এলাকা এক, না ভাষা। শুধুই আল্লাহর দীনের বিজয়ের জন্য, এই উম্মতের

ম্রিয়মাণ সম্মানকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য, ইসলামের দুশমনদের থেকে মুসলমানদের প্রতিরক্ষার জন্য। এ জন্য আমাদের ভাবতে হবে, তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী? আমাদের ভাবতে হবে, এখন পর্যন্ত আমরা তাদের সঙ্গে আছি, নাকি তাদের দুশমনের সঙ্গে? তাদের খুশি করেছি, নাকি তাদের যখমিই করছি? আমাদের উচিত অতীত হয়ে যাওয়া পবিত্র আত্মাগুলোর মতো অন্তরে তাদের সম্মান জম্মানো। আঁধারের সমুদ্রে ডুবে যাওয়ার পরিবর্তে তাদের কাছে আলো ধার চাওয়া। সাহস যখন দেওয়া হয়েছে, তখন তাদের থেকে দিল ধার নেওয়া। ওয়াসওয়াসা, সন্দেহ, ধারণা ও অবিশ্বাস এসে বেষ্টম করেছে? তাহলে নিশ্চিত বিশ্বাস, দৃশ্যমান ইমান অর্জন করে নাও। যদি শক্তি ক্ষয় হয়ে থাকে, পণ শেষ হয়ে থাকে, তাহলে সেসব সিনার সঙ্গে সিনা মিলিয়ে নাও, যাতে দৃঢ়পণ, বিরামহীন ত্যাগ, গর্জন ও চমকানো বিজলি ভরা রয়েছে।

হাসান বসরী রহ. : সত্যবাদিতা ও নির্ভীকতা

آئین جوان مرداں حق گوئی و بے باکی

اللہ کے شیروں کو بھاتی نہیں روباہی

এসো সত্যবাদী নির্ভীক নওজোয়ান

আল্লাহর সিংহরা মাথা নাহি নোয়ান।

হাসান বসরী রহ. ২১ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর মাতা ছিলেন উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা রা.-এর বাঁদী। সুতরাং যখনই তাঁর আম্মা কোনো কাজে ঘরের বাইরে যেতেন, উম্মুল মুমিনীন তাঁকে কোলে নিয়ে দোলাতেন। নিজের স্তন্যও পান করাতেন। কখনো কখনো এমনও হতো; তিনি তাঁকে বাইরে সাহাবায়ে কেরামের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে কোলে নিতেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করতেন।

একবার উম্মে সালামা রা. তাঁকে ওমর রা.-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ওমর রা. তাঁকে কোলে নিয়ে এই দোয়া করেন, হে আল্লাহ, তাঁকে দীনের গভীর বুঝ দান করুন এবং মানুষের কাছে প্রিয় করুন। *[সিয়ারে আলামুন নুবালা ৪:৫৬৫।]*

আল্লাহ তায়ালা হাসান বসরী রহ.কে ইলমের খাজানা, স্পষ্টভাষিতা, বাগ্মিতা, সত্যবাদিতা, নির্ভীকতা ও দীনের সঠিক বুঝ দান করেছিলেন। এটি সাহাবায়ে কেরামের দোয়া এবং উম্মুল মুমিনীন রা.-এর লালন-পালনের বরকত ছিল। তিনি সমাজে জন্ম নেওয়া কারাবিগুলো উপলব্ধি করলেন। নেফাক, যা মুসলিম

সমাজকে ঘুণের মতো কুরে কুরে খাচ্ছে, তা তিনি স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করলেন। তিনি নিজের ওয়াজের মাধ্যমে মুনাফিকদের ওপর অবিরত আক্রমণ করতে এবং সত্য বলতে কোনো ভয়ভীতিকে আমলে নিতেন না। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মতো নির্দয় লোকের সামনে কোনো প্রকার ভয়ভীতি ছাড়া সত্য কথা বলতেন। একবার তিনি বলেন, এই উম্মতের ওপর আল্লাহ তায়ালার শান কেমন! কিভাবে একজন মুনাফিক তাদের ওপর এসে গেল? সে একজন বড় মাপের স্বার্থপর। তৎকালীন মানুষজনের অবস্থা ও সাহাবায়ে কেরামের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, হায়! মানব জাতিকে আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ব্যক্তিস্বার্থ ধ্বংস করেছে। কথায় রয়েছে, কাজের কোনো নামগন্ধও নেই। ইলম আছে কিন্তু তার বাস্তবায়নে ধৈর্য নেই। ইমান আছে, কিন্তু একীন থেকে বিলকুল খালি। মানুষ অনেক আছে, কিন্তু মানবতা নেই। আগমন ও প্রস্থানকারীদের আওয়াজ খুব শোনা যায় কিন্তু আল্লাহর এমন একজন বান্দা চোখে পড়ে না, যার সঙ্গে দিল লাগানো যেতে পারে। মানুষ প্রবেশ করল এবং বের হয়ে গেল। তারা সবকিছু জানল, কিন্তু তার পরও ধোঁকা খেল। তারা প্রথমে হারাম করল, তারপর তাকেই হালাল করে নিল। তোমাদের দীন কী? কেবলই জবানের ফোটানি? যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তোমরা কি কিয়ামতের হিসাব-নিকাশকে বিশ্বাস করো? তাহলে উত্তর আসে, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

জমানা আজ আরো একজন হাসান বসরীর অপেক্ষায়। যিনি মুনাফিক ও তাদের ভেতরে লুকায়িত নেফাকির খবর নিতে পারবেন। হেরেম শরিফে তওয়াফ করে, বায়তুল্লাহর ভেতরে প্রবেশ করে, সাচ্চা পাক্কা মুসলমান হওয়ার দাবি করে। কিন্তু নেফাকে ভরপুর অন্তরসমূহকে কেউ বলতে পারবে, হে মুনাফিকের দল, তোমাদের নেফাক তোমাদের আমলের ওপর বিজয়ী। যদিও তোমরা সারা জীবন বায়তুল্লাহর গিলাফের সঙ্গে লেপটে থাকো। তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলকে ছেড়ে তাদের দুশমনদের সাহায্য করছ।

ইমাম আবু হানিফা রহ.

[৮০-১৫০ হিজরি ৬৯৯-৭৬৭ ঈসায়ি]

تھے تو آباء وہ تمہارے مگر تم کیا ہو

ہاتھ پے ہاتھ رکھے منتظرِ فردا ہو

তোমরা কে? অথচ তারা ছিল পিতা তোমাদের,
হাতে হাত রেখে অপেক্ষমাণ কিয়ামতের?

ইমাম আবু হানিফা রহ. ৮০ হিজরিতে কুফায় জম্মগ্রহণ করেন। সেখানেই তিনি শিক্ষা লাভ করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সাহাবায়ে কেরামের সাক্ষাৎ লাভের মর্যাদা দান করেন। তাঁদের মধ্যে আনাস বিন মালেক, আব্দুল্লাহ বিন আবি আউফ, সাহল বিন সাআদ আস সাইদি, আবু তোফাইল এবং আমের বিন ওয়ায়েলাহ রা.ও ছিলেন।

ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর একটি কবিতা–

اعد ذكر نعمان لنا أن ذكره

هو المسك ما كررته يتضوع

আবারও আলোচনা কর নুমানের
তার আলোচনা মেশক আমাদের,
মেশক-আম্বর যতবার নাড়বে
তত বেশি ঘ্রাণ ছড়াবে।

ইলমী মর্যাদা

সুফিয়ান সাওরি রহ. ও আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহ.-এর বাণী, আবু হানিফা তাঁর যুগে গোটা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফেকাহবিদ ছিলেন।

হাফেজ জাহাবি রহ. ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর গুণাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন, যতদূর ফেকাহ, সমসাময়িক সিদ্ধান্ত ও তার সূক্ষ্মতার সম্পর্ক রয়েছে, তা তার পর্যন্তই শেষ হয়েছে। আর মানুষ এ ব্যাপারে তার পরিবারভুক্ত।

তিনি আরো লেখেন, হাফস বিন গিয়াস বলেন, আবু হানিফার কথা চুলের চেয়ে সূক্ষ্ম। জাহেল ছাড়া কেউ তাতে ভুল ধরতে পারে না। *[সিয়ারু আলামিন নুবালা।]*

জারির রহ. বলেন, আমাকে মুগিরা বলেছেন, আবু হানিফার মজলিসে বসো ফকিহ হয়ে যাবে। যদি ইবরাহিম জীবিত থাকতেন, তাহলে তিনিও তাঁর মজলিসে বসতেন। *[সিয়ারু আলামিন নুবালা।]*

তাকওয়া

বর্ণিত আছে, তিনি সাত হাজারবার কুরআন খতম করেছেন। প্রতি রাতে একবার কুরআন খতম করতেন। চল্লিশ বছর পর্যন্ত এশার অজু দিয়ে ফজর নামাজ পড়েছেন। খতিবে বাগদাদি রহ. নিজের সনদে বর্ণনা করেন, ইমাম সাহেব রহ. রাতে নফল পড়তেন। প্রতি রাতে একবার কুরআন খতম করতেন। তিনি এত কান্না করতেন যে তাঁর ওপর প্রতিবেশীদের দয়া হতো। তার মৃত্যু এমন স্থানে হয়েছে, যেখানে তিনি সত্তর হাজারবার কুরআন খতম করেছেন। জানাজায় এত ভিড় হয়েছিল যে ছয়বার জানাজা পড়া হয়েছিল। *[আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া।]*

হাফেজ জাহাবি রহ. সাক্ষী দেন, তিনি দয়ালু, দানশীল, পবিত্র, আল্লাহওয়ালা, তাহাজ্জুদগুজার, অধিক তেলাওয়াত ও কিয়ামুল লাইলে উল্লেখযোগ্য ছিলেন। *[তারিখুল ইসলাম লিজ জাহাবি ৯:৩০৬।]*

সবশেষে ইমাম জাহাবি রহ. লেখেন, আবু হানিফা রহ.-এর অবস্থা এবং মর্যাদা এই ইতিহাস বহন করতে অক্ষম।

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর ইলমী অবস্থান, তাকওয়া পরহেজগারি, সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকে বেঁচে থাকার উপমা তিনি নিজেই। এ ঘটনা থেকে তাঁর সতর্কতার অনুমান করা যায়–

একবার কুফাতে এক মহিলার বকরি হরিয়ে যায়। এর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই তিনি তত দিন পর্যন্ত বকরির গোশত খাননি, যত দিন এই বকরির কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি যে বকরিটি মারা গেছে। তাঁর আশঙ্কায় ছিল, হতে পারে কেউ এই বকরি জবাই করে বাজারে বিক্রি করে দিয়েছে। চিন্তা করুন, কোনো মানুষ কেবল সন্দেহবশত কত দিন গোশত খাওয়া থেকে বিরত থাকতে পারে? এক সপ্তাহ, এক মাস, বেশি থেকে বেশি কয়েক মাস? তিনি সাত বছর পর্যন্ত বকরির গোশত খাননি। সাত বছর পর যখন জানতে পারলেন ওই বকরি মরে গেছে, তখন তিনি গোশত খেতে শুরু করলেন। একদিকে তাঁর

ইলমী খেদমত, অপরদিকে সত্যবাদী, অমুখাপেক্ষিতা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ এবং শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে কী ভূমিকাই না রেখেছেন। খলিফা আবু জাফর মনসুর তাঁকে প্রধান বিচারক নিয়োগ দিতে বারবার অনুরোধ করতে থাকেন কিন্তু তিনি তা কবুল করেননি। তাঁর উপহারও তিনি কবুল করতেন না।

কারাগারে ইমামে আজম রহ.-এর ওপর নির্যাতন

একদিন খলিফা মনসুর কসম করে বললেন, আপনাকে আমার প্রস্তাব কবুল করতেই হবে। তার জবাবে তিনিও কসম করে বললেন, আমি প্রস্তাব কবুল করব না। মানসুরের দারোগা বলল, দেখুন! আমিরুল মুমিনীন কসম করেছেন, আপনিও কসম করছেন। তিনি জবাব দিলেন, আমিরুল মুমিনীন নিজের কসমের কাফফারা আদায় করতে আমার চেয়ে অধিক সক্ষম। *[সিয়ারু আলামিন নুবালা লিজ জাহাবি।]*

সুতরাং মানসুর কারাগারে বন্দি করার আদেশ করল। অবশেষে জেল থেকে জানাজা বের হয়। মানসুর ইমামে আজম রহ.কে তাঁর পুলিশ অফিসার হামিদ তোছির হাওয়ালা করে দেয়। হামিদ তোছি বলেন, আমিরুল মুমিনীন যে ব্যক্তিকেই আমার হাওয়ালা করে দেন, আমাকে বলেন আমি যেন তাকে কতল করে ফেলি অথবা হাত-পা কেটে দিই অথবা কঠোর শাস্তি প্রদান করি।

ইমামে আজম রহ. খুবই প্রশান্ত অবস্থায় জবাব দিলেন, তোমাকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে তা দ্রুত বাস্তবায়ন করে ফেলো। *[সিয়ারু আলামিন নুবালা লিজ জাহাবি।]*

ফকিহ আবু আব্দুল্লাহ সমিরি রহ. বলেন, ইমাম সাহেব রহ.কে কারাগারে অমানবিক নির্যাতন করা হয় এবং তিনি কারাগারেই ইন্তিকাল করেন। *[সিয়ারু আলামিন নুবালা লিজ জাহাবি।]*

হিশাম বিন আব্দুল মালেকের শাসনামলে খান্দানে রসুল সা.-এর চেরাগ সায়্যিদুনা হুসাইন রা.-এর পৌত্র, জায়েদ বিন আলী বিন হুসাইন রা. হিশামের বিরুদ্ধে জিহাদের ঝাণ্ডা উঁচু করেন। ইমাম সাহেব রহ.-এর সাহসিকতা এবং বাহাদুরি দেখুন, প্রকাশ্যে তিনি জায়েদ রহ.-এর রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তিনি তাঁর খেদমতে দশ হাজার দেরহাম পাঠান এবং উপস্থিত হতে না পেরে ওজর পেশ করেন। তারপর হাসান রা.-এর বংশধর থেকে মুহাম্মাদ জুন নাফস জাকিয়াহ রহ. মদীনা মুনাওয়ারায় এবং তার ভাই ইবরাহিম বিন আব্দুল্লাহ কুফায় মানসুরের বিরুদ্ধে জিহাদের ঝাণ্ডা বুলন্দ করেন। ইমাম মালেক রহ. মদীনা

মুনাওয়ারায় মুহাম্মাদ জুন নাফস জাকিয়াহকে এবং আবু হানিফা রহ. কুফায় ইবরাহিম বিন আব্দুল্লাহর সহযোগিতা করেন। তিনি কিছু টাকা-পয়সাও তাঁর খেদমতে পাঠান। তিনি মানসুরের সেনা অফিসার হাসান বিন কহতবাকে ইবরাহিম রহ.-এর মোকাবিলা করা থেকে বিরত রাখেন। ফলে সে খলিফার কাছে ওজর পেশ করে। মানসুর ইমাম সাহেবের বিরুদ্ধে যে প্রতিশোধ নেয়, তা মূলত এই কারণেই। সে প্রধান বিচারকের পদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানকে উদ্দেশ্য বাস্তাবায়নে বাহানা বানায়। কারাগারে তাঁকে কঠোর নির্যাতন করা হয়। তারপর বিষ দেওয়া হয় এবং কারাগার থেকে জানাজা বের করা হয়।

ইমাম সাহেব রহ.-এর জানাজা জেল থেকে বের হয়েছে

বলা খুবই সহজ। কিন্তু একটু চিন্তা করুন, ইমামে আজম রহ.-এর জানাজা কারাগার থেকে বের হয়েছে। হাফেজ জাহাবি রহ. বলেন, তিনি শাহাদাতের মৃত্যুবরণ করেছেন। যাঁর ব্যাপারে আলী বিন আছেম রহ. বলেন, যদি ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর ইলম ওজন করা হয়, তাহলে তাঁর জামানার সবার ইলমের চেয়ে বেশি হবে। *[সিয়ারু আলামিন নুবালা ৬:৪০৩।]*

এই সেই আবু হানিফা রহ., আমরা যার নাম নিই। আমরা যাঁর তাকলিদ করার দাবি করি। যাঁর মর্যাদা, বড়ত্ব আর মাসায়েল পড়তে ও পড়াতেই আমাদের জিন্দেগি শেষ হয়ে যায়। আফসোস! যদি কখনো ভাবতেন তিনি কী ছিলেন? কী দরদ ছিল তাঁর দীনের প্রতি? কত ব্যথা ছিল দীনের জন্য? বৃদ্ধ বয়সে তিনি মুরিদানের বেষ্টনীতে থাকার পরিবর্তে কারাগারের একাকিত্বকেই বেছে নিলেন। তিনি কেমন ফেকাহ পড়েছিলেন, কোনো ব্যাখ্যা (তাবিল) অথবা কোনো ফেকহি শাখার (জুজের) বাহানা করেননি। শেষ বয়সে শাগরিদের সভায় ঘুরে বেড়ানোর পরিবর্তে জিন্দানখানার চুল্লির দিকেই ঝুঁকে গেলেন। দরসের মসনদের গুরুত্বও 'মাসলাহাত আর হেকমতের' জুব্বা হয়ে সামনে এসেছিল। এ কথা বোঝানোর চেষ্টাও করা হয়েছিল যে বর্তমান খলিফার (মানসুর) বিরুদ্ধে যুদ্ধকে কিভাবে জায়েজ বলেন? এটা তো মুসলমানদের পারস্পরিক লড়াই। আপনি ফেকাহ পড়াতে থাকুন। চুপ থাকুন। (প্রধান কাজি হওয়ার) প্রস্তাব কবুল করলে কী সমস্যা? এটাও তো ইসলামী খেলাফতের কাজির প্রস্তাব। কিন্তু সাবেতের (নুমান বিন সাবেত) বেটার কদম 'সাবেত'ই (সুদৃঢ়) থাকল। একবার যার জবাব 'না' এসেছে। সুতরাং জান গেলেও সেই 'না'কে 'হ্যাঁ'তে রূপান্তর করা যাবে না। এ কথা চিন্তার বিষয় যে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি এমন যুগে ছিল, যাকে সর্বোত্তম তিন যুগের মধ্যে ধরা হতো। খেলাফত প্রতিষ্ঠিত ছিল। চারদিকেই ইসলামের

জয়গান। ইসলামের বিধিবিধান কার্যকর হচ্ছে। মুসলমানদের জান, মাল, ইজ্জত, আব্রুর ওপর কাফেরদের পক্ষ থেকে কোনো ভয় নেই। খলিফাও বর্তমান শাসকগোষ্ঠী থেকে কোটি গুণ ভালো। সে না নামাজ পড়াকে বাতিল করেছে, না জিহাদকে। কল্পনা করুন, ইমাম সাহেব যদি জানতে পারেন, তার ভক্তরা কাফেরদের গোলামি করছে, তাঁর ফেকাহ থেকে ইহুদি, নাসারা ও হিন্দুদের আনুগত্যকে জায়েজ ফতোয়া দেওয়া হচ্ছে। এর ওপর আবার গর্ববোধও করছে যে সে দীনের বড় খেদমত করছে। কিয়ামতের দিন যদি তিনি আমাদের আঁচল ধরে ফেলেন, তাহলে কী জবাব দেব? যেই ইমামের দৃষ্টিতে সোনালি তিন যুগের শাসকগোষ্ঠী বাতিল, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদকারীদের সরাসরি সঙ্গ দিয়েছেন, যদি তিনি জানতে পারেন তার অনুসারীরা হিন্দুস্তানে হিন্দুদের গোলামিতে সন্তুষ্ট, তাঁর অনুসারীরা (দারুল হারব) আমেরিকা-ব্রিটেনে বসবাস করছে, তারা জিহাদ করছে না, তাগুতদের নিজেদের আমির বলে স্বীকার করে নিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদকে নাজায়েজ বলছে, আল্লাহর দুশমনদের সাহায্যকারীদের হক প্রমাণিত করতে ইমাম সাহেবের ফেকাহ থেকে দলিল পেশ করছে, তাহলে কী জবাব দেব?

হে ইমাম আবু হানিফার অনুসারী, আপনি কি কখনো ভেবেছেন, কিয়ামতের দিন এই পবিত্র আত্মার মুখোমুখি কিভাবে হবেন? আমেরিকার আনুগত্যের ওপর সন্তুষ্ট থেকে, ইসলামের বিরুদ্ধে ঘোষিত যুদ্ধে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সা.-এর দুশমনদের সারিতে দাঁড়িয়ে, তাবিলের (ব্যাখ্যা) বাহানা দিয়ে এমন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বাহাস করা যাবে, যার ফেকহি সূক্ষ্মতা ও গভীরতা দুনিয়াজুড়ে খ্যাত? আবারও পড়ুন। দিলের চোখ খুলে পড়ুন। ইমামে আজম রহ.-এর জানাজা জেল থেকে বের হয়েছে। চাবুকের আঘাত খেয়েছেন, তিলে তিলে কঠিনতম শাস্তি সহ্য করে মাহবুবে হাকিকির (আল্লাহর) সঙ্গে মিলেছেন। আসমান ও জমিনের প্রশস্ততা বরাবর রহমত বর্ষিত হোক নুমান বিন সাবেত আবু হানিফা রহ.-এর ওপর। যিনি নিজের জীবন কুরবান করে শরিয়তের আব্রু হেফাজত করেছেন। আমীন।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.

তোমাদের প্রতিজ্ঞা থেকে আমরা পাই হিম্মত।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. ১৬৪ হিজরি মোতাবেক ৭৮০ ঈসায়ি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের আগেই তাঁর বাবার ইন্তেকাল হয়। ফলে তাঁর আম্মা সর্বাত্মক সাহসিকতা ও হিম্মতের সঙ্গে তাঁকে লালন-পালন করেন। শিশুকালেই কুরআন হিফজ করেন। তিনি দীনি ইলমের মধ্যে হাদিসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে অসাধারণ স্মৃতিশক্তি দিয়েছিলেন। তাঁর দশ লাখ হাদিস মুখস্থ ছিল। ফেকাহ শাস্ত্রে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এত উঁচু মর্যাদা দিয়েছেন যে আজ পর্যন্ত ইসলামী বিশ্বে তাঁর ফেকাহ বিদ্যমান। হাদিস শাস্ত্রে তাঁর 'মুসনাদে আহমদ' বড় কৃতিত্ব।

ইমাম শাফেয়ি রহ. (১৫০-২০৪ হিজরি/৭৬৭-৮২০ ঈসায়ি) বলেন, আমি এমন অবস্থায় বাগদাদ ছেড়েছি, যখন সেখানে আহমদ বিন হাম্বলের চেয়ে বড় কোনো মুত্তাকিও ছিল না, কোনো ফকিহও ছিল না।

মসনদে হাদিসে বসলে হাদিসের তালেবানরা পতঙ্গের মতো তাঁর চারপাশে জমা হতো। তাঁর এককেটি দরসে পাঁচ হাজার করে শ্রোতা থাকত। আত্মসম্মানবোধে তাঁর উপমা তিনি নিজেই। তিনি কখনো তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর কোনো হাদিয়া গ্রহণ করেননি। তাঁর নম্রতা ও ভদ্রতা এত বেশি ছিল যে ইয়াহইয়া বিন মুঈন (১৫৮-২৩৩ হিজরি/৭৭৫-৮৪৮ ঈসায়ি)-এর মতো ইমাম সাক্ষী দেন, আমি আহমদ বিন হাম্বলের মতো লোক দেখিনি। আমি তাঁর সঙ্গে ৫০ বছর ছিলাম। তিনি কখনো আমাদের সামনে নিজের যোগ্যতা ও সৌন্দর্য নিয়ে গর্ব করেননি।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. এবং খলকে কুরআনের ফেতনা

খলিফা মামুনুর রশীদ (১৯৮-২১৮ হিজরি/৮১৩-৮৩৩ ঈসায়ি) ইউনানি দর্শন ও যুক্তি দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তাঁর শাসনামলে মুতাজেলা ফেরকা খুব শক্তিশালী হয়। তাদের সে সময়ের আলোকিত বুদ্ধিজীবী মনে করা হতো। তারা প্রত্যেক বিষয়কে আকল দ্বারা পরখ করায় অভ্যস্ত ছিল। (মনে রাখা উচিত, বর্তমানের মডার্ন ইসলামের ঝাণ্ডাবাহী মুবাল্লিগরা চকচকে ও নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রফেসররা এ যুগের মুতাজেলা। তাঁরা প্রতিষ্ঠিত দীনকে আকল দ্বারা পরখ করার পর মেনে নেন। যদি কোনো হাদিস অথবা কোনো হুকুম তাঁদের ক্ষুদ্র আকলে বুঝে না আসে, তাহলে তা প্রত্যাখ্যান করেন।)

মুতাজেলারা নতুন নতুন ইখতেলাফের মাধ্যমে উম্মতে মুসলিমার ঐক্যকে টুকরো টুকরো করেছে। ইসলামের দুশমন শক্তিগুলো সাধারণ বিষয়কে জনসাধারণের সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করে, যেন এটাই ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাঁরা ইলমী ও দর্শনশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়কে কুফর ও ইমানের বিষয়বস্তুতে রূপান্তরিত করে। আল্লাহ তায়ালার সত্তা ও গুণাবলির ব্যাপারে মানুষের অন্তরে এমন এমন প্রশ্ন সৃষ্টি করে যে সাধারণ মানুষ পেরেশান হয়ে যায়। এমনিভাবে তারা একটা বিষয় উপস্থাপন করে, 'কুরআন মাখলুক, নাকি মাখলুক নয়?' মুতাজেলারা কুরআন মাখলুক হওয়ার কথা বলে। তৎকালীন হুকুমত তাদের পৃষ্ঠপোষক ছিল। আর তাদের মোকাবিলায় ছিলেন মুহাদ্দিসীন ও ফুকাহায়ে কেরামের বিশাল দল। যারা ছিল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ধারক-বাহক। আহলে সুন্নাত 'কুরআন' মাখলুক না হওয়ার পক্ষে, অর্থাৎ আল্লাহর কালাম হওয়ার পক্ষে ছিলেন। চক্রান্তের বিষয়বস্তুর মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের অন্তর থেকে কুরআনের বড়ত্ব, গুরুত্ব ও মর্যাদা বের করে দেওয়া, যাতে উম্মত হেদায়াতের মূল ঝরনা থেকেই দূরে ছিটকে পড়ে। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর দূরদৃষ্টি এই ফেতনার দূরাগত প্রভাব দেখছিল। সুতরাং হককে হক ও বাতিলকে বাতিল প্রমাণ করার জন্য সাহাবায়ে কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইমাম সাহেব রহ. সব কিছু কুরবানি করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন।

মামুন খলকে কুরআনের মাসআলাকে খুবই গুরুত্ব দেয়। ২১৮ হিজরিতে বাগদাদের গভর্নর ইসহাক বিন ইবরাহিমের নামে বিস্তারিত এক ফরমান পাঠায়, যাতে মুহাদ্দিসীনে কেরামের কঠোর সমালোচনা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয়। তাঁদের খলকে কুরআনের আকিদায় ইখতেলাফ করার কারণে তাওহিদে ত্রুটি, সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়, ফাসাদপ্রিয় ইত্যাদি আখ্যায়িত করা হয়। (বর্তমানেও মুতাজেলা নামক বাতিলদের সামনে মাথা না নোয়ানো ব্যক্তিদের ফেতনাবাজ, সন্ত্রাসী বলা হয়।) হাকিমকে হুকুম করা হলো, যেসব লোক এই মাসআলার পক্ষে না আসবে, তাদেরকে তাদের পদ থেকে বরখাস্ত করে দাও। তারপর মামুন আরো কঠোরতা করল। সরকারি কর্মকর্তা ও আলেমদের জন্যও এ ব্যাপারে মুতাজেলাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা বাধ্যতামূলক করে দিল। ইসহাক বড় আলেমদের একত্র করল এবং তাদের সঙ্গে এ মাসআলার ব্যাপারে আলোচনা

করল। তারপর এই আলোচনা লিখে মামুনের কাছে পাঠিয়ে দেয়। মামুন সব কিছু পড়ে খুবই রাগান্বিত হলো এবং সেসব আলেমদের মধ্যে বাশার বিন ওয়ালিদ ও ইবরাহিম বিন মাহদিকে হত্যার নির্দেশ দেয়। আর বাকিদের ব্যাপারে লিখল, যারা নিজের রায় থেকে ফিরে না আসবে তাঁদের পায়ের ওপর ঝুলিয়ে তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য। বাকি আলেমদের মোট সংখ্যা ছিল ত্রিশজন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেবল চারজন নিজের রায়ের ওপর স্থির থাকেন। তাঁরা হলেন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ., সাজ্জাদাহ, কওয়ারিরি ও মুহাম্মাদ বিন নুহ রহ.। তাঁদের মধ্যেও সাজ্জাদাহ দ্বিতীয় দিন এবং কওয়ারিরি তৃতীয় দিন নিজের অবস্থান থেকে সরে আসেন।

ইমাম সাহেব রহ. ও মুহাম্মাদ বিন নুহ রহ. শেষ পর্যন্ত নিজের অবস্থান ধরে রাখেন। সুতরাং ইমাম সাহেব রহ. ও মুহাম্মাদ রহ.কে হাতকড়া এবং বেড়ি লাগিয়ে মামুনের কাছে তরসুসে (বর্তমান তুর্কির একটি শহর) পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সম্ভবত হাতকড়া ও বেড়ি এমন বরকতময় হাত-পায়ে চুমো দেওয়ার জন্যই বানানো হয়েছিল। ইমাম সাহেব রহ.-এর সহযাত্রী ও সহমর্মী অন্যান্য স্থানের উলামায়ে কেরামও ছিলেন। এসব উলামায়ে কেরাম রাস্তায় থাকাবস্থায়ই মামুনের মৃত্যুর খবর আসে। সুতরাং সব উলামায়ে কেরামকে বাগদাদের গভর্নরের কাছে বাগদাদ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পথেই মুহাম্মাদ বিন নুহ রহ.-এর ইন্তেকাল হয়ে যায়।

মামুনের পর মুতাসিম খলিফা হয়। মামুন তার স্থলাভিষিক্তকে খলকে কুরআনের মাসআলার ব্যাপারে কঠোরভাবে অসিয়ত করেছিল—যেন সে এই শিক্ষার ওপর আমল করে। সুতরাং মুতাসিমের সামনে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.কে মুনাজারা (তর্কযুদ্ধ) করার জন্য আনা হলো। ইমাম সাহেব রহ.কে যখন মুনাজারার জন্য আনা হয়, তখন তাঁর পায়ে চারটি বেড়ি লাগানো ছিল। তিন দিন পর্যন্ত মুনাজারা হয়। কিন্তু ইমাম সাহেব রহ. আপন বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হননি। বাগদাদের হাকিম ধমক দিলেন, যদি তুমি কথা না মানো, তাহলে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। এমন জায়গায় ফেলে দেওয়া হবে, যেখানে কখনো সূর্যের আলো পৌঁছে না।

আখিরাতের সওদায় যাদের অন্তর ভরপুর, যাদের সিনা নবুওয়াতের নূরে আলোকিত, তাদের জন্য দুনিয়া কেড়ে নেওয়ার ধমকি অথবা সূর্য হারিয়ে যাওয়ার ভীতি কোনো অর্থ বহন করে না। সুতরাং তিনি কোনো ধমকে প্রভাবিত হলেন না। ভরা মজলিসে সরকারি উলামা-মাশায়েখের সঙ্গে মুনাজারা করতে থাকেন। তার একটাই জবাব ছিল, তোমরা যা বলছ, তার পক্ষে কুরআন-

হাদিসের কোনো প্রমাণ নিয়ে আস, আমি তা মেনে নেব। তার সাহসিকতা ও নির্ভীকতা খলিফা মুতাসিমকে প্রভাবিত করল। ফলে সে ইমাম সাহেব রহ.-এর ওপর নরম হতে লাগল। সে ইমাম সাহেব রহ.কে বলল, যদি আপনি আমার অগ্রজের হাতে না লাগাতেন, তাহলে কখনো আমি আপনাকে স্পর্শ করতাম না। কিন্তু দরবারি উলামা-মাশায়েখ তাকে উত্তেজিত করতে থাকে। মানুষ আপনাকে বলবে, মুতাসিম তার ভাই মামুনের বিশ্বাস থেকে সরে গেছে।

সরকারি উলামা-মাশায়েখেরও সীমাবদ্ধতা ছিল যে এই মাসআলার ব্যাপারে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা থেকে যে পুঁজি ভাগে আসত, তা-ই ছিল তাদের পেটের ইন্ধন। কুরআন-সুন্নাহ নিয়ে তাদের কী গরজ পড়েছে? তাদের উদ্দেশ্য একটাই ছিল, খাহেশাত পূর্ণ করা, দুনিয়ার স্বাদ উপভোগ করা, হুকুমতের পদের ফায়দা লোটা এবং সরকারি দরবার থেকে পাওয়া দিরহাম-দিনার দিয়ে ঘরের সিন্দুকের মুখ ভরা। এ ব্যাপারে তাদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না যে ইতিহাস তাদের ব্যাপারে কী বলবে, আগামী প্রজন্ম তাদের কিভাবে স্মরণ করবে, আখিরাতে মুহাম্মদ সা.-এর সামনে তারা কোন অবস্থায় দাঁড়াবে–আকায়ে মাদানি সা.-এর বন্ধুদের সঙ্গে নাকি দুশমনদের সঙ্গে?

তারপর তৃতীয় দিন মুতাসিম ইমাম রহ.কে বলল, আল্লাহ তোমার ওপর রহম করুন, তুমি আমার কথা মেনে নাও, আমি তোমাকে আযাদ করে দেব। তিনি জবাব দিলেন, কুরআন ও হাদিস থেকে কোনো প্রমাণ নিয়ে আসো।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের হাত কেটে ফেলো

মুতাসিম খুব রাগান্বিত হলো। জল্লাদকে হুকুম দিল, তাঁর হাত কেটে দাও। জল্লাদ দুই চাবুক মারল। তারপর অন্য জল্লাদ নিয়ে আসা হলো। এভাবে প্রত্যেক জল্লাদ পূর্ণ শক্তিতে দুই চাবুক মেরে পেছনে হটে গেল। উনিশটি চাবুক মারার পর মুতাসিম পুনরায় ইমাম সাহেবের সামনে এলো এবং বলল, কেন নিজের জানের পেছনে লেগেছ? আল্লাহর কসম! তোমার প্রতি আমার খুবই খেয়াল আছে।

যে আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নেয় এবং তার ওপর স্থির হয়ে যায়, এমন আত্মবিশ্বাসী লোকের সামনে আসমান থেকে রহমতের ফেরেশতা নামে। যাঁরা তাঁদের অন্তরকে প্রশান্তি দিতে থাকেন এবং হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন। আজও আল্লাহ তায়ালার এই সুন্নত প্রতিষ্ঠিত আছে। আজও দুনিয়াজুড়ে কারাগারগুলো এমনিভাবে সেসব আল্লাহওয়ালাদের দিয়ে ভরে দেওয়া হয়েছে,

যারা বাতিলের সামনে মাথা নোয়াতে অস্বীকার করেছে। যদি জুলুমের সামনে কেউ না দাঁড়াত, তাহলে প্রত্যেক জালেম বিজয়ী হতো। প্রত্যেক অত্যাচারী কামিয়াব ও সফল হয়ে যেত। আর প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তি ভেঙে কয়েক টুকরা হয়ে যেত এবং নিজেদের বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি ও সুনির্দিষ্ট আশা ছেড়ে অত্যাচারী আর জালেমের দীন গ্রহণ করত।

উনিশটি চাবুক খাওয়ার পরও ইমাম সাহেব রহ.-এর আত্মবিশ্বাস ও প্রতিজ্ঞায় সামান্যতমও ফাটল ধরেনি। তিনি সেই জবাবই দিলেন, যা প্রথমে দিয়েছিলেন। মুতাসিম পুনরায় চাবুক মারার হুকুম দিল। তারপর তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন।

সেই চাবুকের ব্যাপারে বলা হয়, তা এমন চাবুক ছিল, যদি একটি চাবুক কোনো হাতিকে মারা হতো তাহলে হাতি চিৎকার করে পালিয়ে যেত। ইমাম সাহেব রহ. রোজা ছিলেন। কেউ বলল, আপনার জান বাঁচানোর জন্য এই আকিদাকে মেনে নেওয়ার সুযোগ আছে। কিন্তু তিনি তার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপই করলেন না। লোকেরা তাঁকে বোঝাতে চাইলেন এবং জান বাঁচানোর হাদিস শোনালেন। তিনি জবাব দিলেন, তাহলে খাব্বাব রা.-এর হাদিসের জবাব কী? যাতে বলা হয়েছে, প্রথমে কিছু লোক এমন ছিল, যাদের মাথার ওপর করাত চালিয়ে দেওয়া হতো, তার পরও তাঁরা নিজের দীন থেকে সরে আসত না।

একবার কোনো একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করল, আপনি এসব করছেন, আপনার ভয় হয় না? এর জবাবে তিনি বলেন, ভয় তো সে পাবে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে।

ইমাম সাহেব রহ.কে দুই বছর চার মাস কারাগারে রাখা হয়। এ সময় ৩৩-৩৪ বার চাবুক মারা হয়। আল্লামা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভি রহ. 'তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমত' গ্রন্থে লেখেন, ইমাম আহমদ রহ.-এর উপমাহীন দৃঢ়পদ ও অটলতার দরুন এই ফেতনা চিরদিনের জন্য খতম হয়ে যায়। ফলে মুসলমান এক বড় দীনি বিপদ থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। যারা দীনের সেই ক্রান্তিকালে তৎকালীন হুকুমতের সঙ্গ দিয়েছে, সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন হয়েছে এবং মাসলাহাতের দোহাই দিয়ে কাজ করেছে, তারা মানুষের দৃষ্টি থেকে সরে গেছে। তাদের দীনি ও ইলমী গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে গেছে। পক্ষান্তরে ইমাম আহমদ রহ.-এর শান দ্বিগুণ হয়ে বেড়ে গেছে। তার মহব্বত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এবং সহীহ আকিদাসম্পন্ন মুসলমানদের পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁরই এক সমকালীন ব্যক্তিত্ব কুতাইবা বলেন, যখন তোমরা কাউকে দেখবে আহমদ বিন হাম্বলের সঙ্গে তার মহব্বত আছে, তাহলে বুঝে

নেবে সে সুন্নাতের অনুসারী। অপর একজন আলেম আহমদ বিন ইবরাহিম দাওরাকি রহ. বলেন, যাকে তোমরা আহমদ বিন হাম্বলের সমালোচনা করতে শুনবে, তার ইসলামকে তোমরা সন্দেহের চোখে দেখবে। *[তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমাত ১:১০০।]*

> ইমাম সাহেব ৭৭ বছর বয়সে ১২ রবিউল আওয়াল জুমার দিন ২৪১ হিজরি/৮৫৫ ঈসায়িতে নিজের মাবুদে হাকিকির সঙ্গে মিলিত হন। ইন্তেকালের সংবাদ শুনতেই গোটা শহর ছুটে আসে। তার জানাজার মতো এত ভিড় ইতিপূর্বে অন্য কারো জানাজায় দেখা যায়নি। জানাজায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যার ব্যাপারে বলা হয়, আট লাখ পুরুষ এবং ৬০ হাজার নারী উপস্থিত ছিল। অবিচলতার এই ইতিহাস ওই সওদাগর কখনোই বুঝতে পারবে না, যার শিরায় শিরায় মাসলাহাত প্রবাহিত হয়েছে। যে দীনের প্রত্যেকটা বিষয়কে দুনিয়াবি লাভ-ক্ষতির মাপকাঠিতে পরখ করার পর তা হক-বাতিল হওয়ার ফায়সালা করে। তাদের দৃষ্টিতে এসব অবিচলতাকে জজবার অতিরঞ্জন, প্রাবল্য এবং হেকমত ও মাসলাহাত পরিপন্থীই মনে হবে।

অতীত আমাদের আয়না

খলকে কুরআনের ফেতনার ব্যাপারে হুকুমতের সঙ্গ দানকারীদের সরকারি আওতায় খুব খোশামোদি হবে। তাদের জ্ঞান-গরিমা, কৃতজ্ঞতা, মধ্যমপন্থী ও আলোকিত চেতনার খুব কবিতা-গীত গাওয়া হবে। শাহী দরবার থেকে তাদের ব্যাপারে দেশপ্রেমিক, দেশ ও জাতির দরদি, শান্তিবাদী ও কল্যাণকামী হওয়ার খেতাব দেওয়া হবে। কিন্তু এসব খেতাব ও সম্মান পৃথিবীর কোনো ইতিহাসে বিদ্যমান আছে? আল্লাহ্ মালুম সেসব উচ্ছিষ্টের ঝুড়িরও কোন ডাস্টবিন জুটেছে, যাতে এসব সরকারি খেতাব ফেলে দেওয়া হবে? তৎকালীন হুকুমতের পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও উম্মতে মুহাম্মাদিয়া সা. এসব সরকারি উলামা-মাশায়েখকে কিভাবে স্মরণ রেখেছেন? হুকুমতের পক্ষ থেকে সম্মান দেওয়ার পরও মুসলমানগণ তাদের কী মর্যাদা দিয়েছে? তাদের নাম জানে—এমন কতজন আছে বর্তমানে? অথবা তাদের মোকাবিলায় ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.কে তৎকালীন হুকুমত ফেতনাবাজ, ফাসাদপ্রিয় ইত্যাদি নাম দিয়েছিল। আল্লাহ

তায়ালা তাঁকে কেমন ইজ্জত দিয়েছেন? যে কেউ তাঁর নাম নিলে তাঁর ওপর রহমত পাঠায়।

এটাই ইতিহাসের সবক। কিন্তু ইতিহাস থেকে উপদেশ গ্রহণকারী খুব কমই থাকে। অতীতের ইতিহাসকে অতীতের মতোই মস্তিষ্ক থেকে অতীত করে দেয়। এ কথা চিন্তা করে না যে বর্তমানেও তেমন ইতিহাস লেখা হচ্ছে। যার ফলে মানুষ তার যুগে ঘটমান ঘটনা এবং কাহিনীকে সেই দৃষ্টিতে দেখে না, যে দৃষ্টিতে ইতিহাসকে দেখে থাকে। বর্তমানের ঘটনাগুলোকে খুবই সীমাবদ্ধ দৃষ্টিতে দেখে। কেউ কোনো দলের গণ্ডিতে, কেউ মাজহাবের গণ্ডিতে, কেউ দেশের গণ্ডিতে বন্দি হয়ে এগুলো দেখে। এমনিভাবে নিজের যুগের হুকুমতের বক্তব্য অনুযায়ী যাদের বিরোধিতা করছে, তাদেরও হুকুমতের দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করে। তারা এ কথা ভুলে যায়, আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর বিরোধীরাও তাঁকে হুকুমতের বিদ্রোহী, আমিরুল মুমিনীনের অবাধ্য, উম্মতের মধ্যে ফাটল সৃষ্টিকারী, হেকমত ও মাসলাহাত পরিপন্থী হিসেবে দেখেছিল।

ভালো-মন্দের যুদ্ধের অবস্থা ও ঘটনা একই হয়। প্রতিপক্ষ এবং অস্ত্র ভিন্ন নামের হতে পারে। তাদের মোকাবিলাকারী এবং তাদের যুদ্ধক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু মূল ভিত্তি একই হয়। মানুষ কেবল অতীতের বাতিল ও ঘোড়সাওয়ারদের সম্মান করে, বর্তমানকে তারা ভুলে যায়। আল্লাহর অগণিত রহমত বর্ষিত হোক ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর ওপর। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণকারীদের ওপর, যারা তাঁরই অবিচলতার পথে ফোস্কা পায়ে মনজিলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যত দিন পর্যন্ত এই বিশ্ব চরাচরে হক-বাতিলের লড়াই জারি থাকবে, তত দিন এই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতেই থাকবে। বাতিল যেই আকৃতি নিয়েই আসুক না কেন, হকের পক্ষ থেকে কোনো আবু হানিফা রহ. অথবা কোনো ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. দাঁড়িয়ে যাবে।

পাকিস্তানের ফেরাউন পারভেজ মোশাররফ প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পৃষ্ঠপোষক। এটা কিভাবে হতে পারে যে বাতিল প্রকাশ্যে ভ্রষ্টতা ছড়াবে অথচ হকের সারি থেকে কেউ তার মোকাবিলায় দাঁড়াবে না? যদি এমনটিই হতো, তাহলে হক-বাতিলের লড়াইয়ের ইতিহাস অপূর্ণ থেকে যেত। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা সেই ইতিহাসকে পূর্ণ করার জন্য পারভেজ মোশাররফের মোকাবিলায় হকের ইমাম, শহীদ মাতা-পিতার গাজি ছেলে, গাজি আব্দুর রশীদ শহীদ রহ.কে পাঠিয়েছেন। যাতে আহলে হককে কেউ অপবাদ দিতে না পারে যে হে অতীত ইতিহাস নিয়ে গর্বকারী, তোমাদের কী অবস্থা?

গাজি আব্দুর রশীদ শহীদ রহ. নিজেকে এবং জামিয়া হাফসার ছাত্রীদের কুরবানি দিয়ে বস্তুত বর্তমানের ইতিহাসকে লজ্জিত হওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। যাঁদের তবিয়তে প্রত্যেক বাতিলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাওয়া মিশে আছে। হে আল্লাহ, অসংখ্য-অগণিত রহমত বর্ষণ করো গাজি শহীদ রহ.-এর ওপর এবং সেসব আত্মমর্যাদাবান ছাত্রীদের ওপর, যারা পুরুষদের পক্ষ থেকে কুরবানি দিয়ে দীনি মর্যাদার অর্থের মান বাঁচিয়েছে।

শায়খ আবদুল কাদির জিলানী রহ.

دارا و سکندر سے وہ مردِ فقیر اولی

ہو جسکی فقیری میں بوئے اسد اللہ

সিকান্দরের বাদশাহী থেকে সেই ফকির উত্তম

যার ফকিরিতে আসাদুল্লাহর ঘ্রাণ আছে।

শায়খ আবদুল কাদির জিলানী রহ. ৪৭০ হিজরিতে জিলান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮ বছর বয়সে বাগদাদ আসেন। সেখানেই তিনি দীনি ইলম হাসিল করেন। তৎকালীন নামকরা উলামায়ে কেরামের সাহচর্যে থাকেন। জাহেরি এবং বাতেনি ইলম অর্জন করে ফারেগ হওয়ার পর মানব জাতির রুহানী চিকিৎসা শুরু করেন। সাধারণ থেকে নিয়ে হাকিম, বড় বড় আলেমও তাঁর মজলিসে শরিক হয়ে দিলের জগতকে আবাদ করেন।

শায়খ জিলানী রহ. নম্রতা ও শালীনতার উপমা ছিলেন। গরিব-মিশকিনদের পাশে বসতেন। তাদের কাপড় পরিষ্কার করতেন। উকুন আনতেন। পক্ষান্তরে কোনো ধনী, সরকারি কর্মকর্তার সম্মানে কখনো দাঁড়াতেন না। খলিফা আগমন করলে ইচ্ছাকৃত ঘরে চলে যেতেন। যখন খলিফা এসে বসে যেতেন, তখন তিনি বের হয়ে আসতেন, যাতে খলিফার সম্মানার্থে দাঁড়াতে না হয়। শায়খ আবদুল কাদির জিলানী রহ.-এর কারামতের আধিক্যের ব্যাপারে ঐতিহাসিকরা একমত। আল্লাহর সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক, সৃষ্টির প্রতি দয়া, দানশীলতা ও মেহমানদারি তাঁর স্বভাবে পরিণত হয়েছিল।

শায়খ আবদুল কাদির জিলানী রহ. এবং সত্যবাদিতা

যাদের অন্তর আল্লাহ তায়ালার জন্য বরাদ্দ হয়ে গেছে এবং আখিরাতের ওয়াদার ওপর বিশ্বাস সুনিশ্চত হয়ে গেছে, সে সমকালীন হাকিম-বাদশাহদের অসন্তুষ্টির পরোয়া করে না। যে অন্তরে কবরের অন্ধকার ও একাকিত্বের ভয় জমে আছে, তাকে জিন্দানখানার অন্ধকার আর একাকিত্ব ভয় দেখাতে পারে না। শায়খ আবদুল কাদির জিলানী রহ.ও হক বলতে কোনো ভয়কে আমলে নিতেন না। সুতরাং দরবারি উলামা মাশায়েখ ও হাকিমদের শুভদৃষ্টি লাভের জন্য ফতোয়া দানকারীদের উদ্দেশে বলেন, হে ইলম ও আমলের খেয়ানতকারী, তাদের সঙ্গে তোমাদের কী সম্পর্ক? হে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সা.-এর দুশমন, খোদার বান্দাদের ডাকাত, তোমরা সরাসরি জুলুম ও সরাসরি নেফাকে লিপ্ত। এই নেফাক কত দিন পর্যন্ত থাকবে? হে আলেমসমাজ, হে দুনিয়াত্যাগী গোষ্ঠী, বাদশাহ ও সুলতানদের জন্য কত দিন পর্যন্ত মুনাফিক হয়ে থাকবে? তাদের থেকে তোমরা দুনিয়ার মাল-দৌলত ও নফসের চাহিদা পূরণ করছ। অধিকাংশ বাদশা বর্তমান জামানায় আল্লাহ তায়ালার মাল ও তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে জুলুম করছে। খেয়ানত করছে। হে আল্লাহ, মুনাফিকদের শক্তি ভেঙে দাও। তাদের অপদস্ত করো। তাদের তাওবার তাওফিক দাও। জালেমদের কেল্লা তছনছ করে দাও। জমিনকে তাদের থেকে পবিত্র করে দাও অথবা তাদের সংশোধন করে দাও। *[তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমত খণ্ড-১।]*

অন্য এক জায়গায় এই স্তরেরই একজনকে খেতাব করে বলেন, তোমার শরম হয় না? তোমার লোভ তোমাকে জালেমদের খেদমত এবং হারামখোরির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তুমি কত দিন পর্যন্ত হারামখোরি এবং জালেম বাদশাহদের খেদমত করতে থাকবে? যাদের খেদমতে তুমি লেগে আছ, তাদের রাজত্ব অচিরেই মিটে যাবে। তোমাকে আল্লাহ তায়ালার খেদমতেই আসতে হবে। যার কোনো ক্ষয় নেই। *[তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমত খণ্ড-১।]*

মানুষ আল্লাহ তায়ালাকে ছেড়ে মানুষের ওপর আশা বেঁধে আছে। কাফেরদের এমনভাবে ভয় পায়, যেমনটি আল্লাহকে পাওয়া উচিত ছিল। বরং এর চেয়ে বেশি পাওয়া উচিত ছিল। শায়খ জিলানী রহ. তাঁর ব্যাপারে বলেন, আজ তুমি ভরসা করছ নিজের ওপর, মাখলুকের ওপর, নিজের দিনার-দেরহামের ওপর, নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর, শহরের হাকিমের ওপর। তুমি যে বস্তুর ওপরই ভরসা করছ, তা তোমার মাবুদ। যে ব্যক্তির ওপর তুমি নির্ভর করছ, সে তোমার মাবুদ। যে ব্যক্তির ওপর তোমার লাভ-ক্ষতির ব্যাপারে নজর পড়বে, এ কথাই

বুঝবে যে আল্লাহ তায়ালাই তার হাতে তা দানকারী। আর সে তোমার মাবুদ। *[তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমত খণ্ড-১।]*

হে আল্লাহর বান্দাগণ, পীরদের পীর শায়খ আবদুল কাদির জিলানী রহ.-এর কথা চিন্তা করুন। তারপর নিজের হিসাব নিন। আমরা কতগুলো মাবুদ বানিয়ে রেখেছি? আল্লাহকে ছেড়ে আমেরিকা ও ইহুদিদের বিশ্ব সংস্থাগুলোকে রিজিকদাতা মানছি? কাফেরদের বক্তব্য শুনে প্রতিষ্ঠিত শরিয়তের বিধি-বিধানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করছি? বসতিগুলোতে বোমাবর্ষণ করার ভয়ে নিজের মুসলমান ভাই-বোনদের কাফেরদের কাছে বিক্রি করছি? আমেরিকা নারাজ হয়ে রিজিক বন্ধ করে দেবে, দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে, এই ভয়ে কুরআনের আয়াতগুলো গোপন করছি? নিজের ঘর বাঁচানোর জন্য কালেমাওয়ালা অন্য মুসলমানদের বাচ্চা, মহিলা ও বৃদ্ধদের ওপর বোম্বিং করাচ্ছি? সেসব হত্যাকারীর সহযোগিতা করে জুলুমের ওপর জুলুম করছি? খুনিদের দুশমন মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে নিজের জবান ও কলম ব্যবহার করছি? একটু চিন্তা করি।

এটা কেমন ইসলাম? ভাবুন, আমরা ইমানের কোন সংজ্ঞার ওপর দণ্ডায়মান? কখনো মূর্তিগুলোর পূজা থেকে অবসর পেলে গণনা করে দেখুন, মুহাম্মাদ সা.-এর রবের সঙ্গে যাদের শরিক করছি, তাদের সংখ্যা কততে পৌঁছেছে? প্রত্যেক জিনিসের পৃথক খোদা বানিয়ে রেখেছি। জীবন-মৃত্যুর খোদা আমেরিকা, টাকা-পয়সা ও ধন-দৌলতের খোদা আইএমএফ, রিজিকের খোদা জাতিসংঘ, পানি-বাতাসের খোদা ভারত, দেশপ্রেম, জাতীয়তা, ভাষাপ্রেম আর নফসের মূর্তি? হাজার মূর্তি রয়েছে দিলের আস্তিনে।

সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী রহ.

(১১৩৮-১১৯৩ ঈসায়ি)

শাসকগোষ্ঠীর জন্য মৌজ-মাস্তির জীবন যাপন করা, নিজের রাজত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য জায়েজ না-জায়েজ সব ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা কোনো মুশকিল কাজ নয়। জাতির পেট কেটে নিজের খাজানার মুখ ভরা দুনিয়াদারদের অভ্যাস। জনসাধারণের জিন্দেগিকে ফসল বানিয়ে নিজের জিন্দেগিতে বাহারি রং লাগানো তাদের শখ। নিজের নফসের চাহিদায় শরীয়তের গিলাফ লাগিয়ে ব্যক্তিস্বার্থ ও আমিত্বকে পবিত্র আইনের মর্যাদা দেওয়া তাদের জন্য সহজ ব্যাপার।

কিন্তু এই দীনের হেফাজতের জন্য আল্লাহ তায়ালা নিজের যেসব বান্দাকে বাছাই করেন, তাদের শান অন্যদের থেকে ভিন্নই হয়। তাদের স্বভাব অন্যদের থেকে ব্যতিক্রম হয়। ইসলামী ইতিহাসের দিগন্তে সেসব উজ্জ্বল নক্ষত্রই বিদ্যমান, যারা অন্ধকার রাতে মুসাফিরদের মনজিলের দিকে পথপ্রদর্শন করছে। যারা নিজেদের চেষ্টা, আত্মত্যাগ, কুরবানি ও আখিরাতের ভয়ের বদলায় যুগে যুগে মুসলমানদের মান বাঁচিয়েছে। নিজে সর্বস্বান্ত হয়ে, দেহ ও আত্মাকে রক্তে রঞ্জিত করে, দিলের দুর্বলতাকে টুকরা টুকরা করে উম্মতের শান্তির সামান তৈরি করেছে। মুসলমানদের আনন্দ দেওয়ার জন্য গোটা বিশ্বের পেরেশানি (যা পাহাড়ে রাখলে কয়লা হয়ে যাবে) নিজের অন্তরে নিয়ে নিয়েছে।

সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী রহ. ইসলামী ইতিহাসের সেই হীরা, যার নাম শুনতেই ইমানদারদের ইমান টগবগ করতে থাকে। বায়তুল মুকাদ্দাসের আজাদি ইসলামী বিশ্বের বাচ্চা শিশুদেরও স্বপ্ন ছিল। তিনিই সেই আল্লাহর ওলি, যিনি প্রথম কেবলাকে কাফেরদের হাত থেকে আজাদ করেন। প্রথমে সেটি ওমর রা.-এর খিলাফতকালে বিজয় হয়। তারপর শাসকগোষ্ঠীর অবহেলা ও মুসলিম উম্মাহর জিহাদ থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে ৪৯৬ হিজরি/১০৯৯ ঈসায়ি কাফেররা দ্বিতীয়বার দখল করে নেয়। বায়তুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের হাত থেকে ছুটে যাওয়া ইসলামী বিশ্বের জন্য বড় ধরনের ধাক্কা ছিল, যার ফলে মুসলমানদের মধ্যে দুর্বলতা ও নৈরাশ্য ছড়িয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে ক্রুসেডারদের সাহস এত বেড়ে গিয়েছিল যে তারা পবিত্র মক্কা-মদিনায় আক্রমণের পরিকল্পনা করে ফেলে। পবিত্র রওজা শরিফের ব্যাপারে বেয়াদবি ও অপমানজনক বাক্য ও ইচ্ছা প্রকাশ করে। এমন সময় ইসলামী বিশ্বে কোনো একজন মুজাহিদের প্রয়োজন ছিল, যিনি জিহাদে বের হয়ে ক্রুসেডারদের সয়লাবের পথে বাধা দিতে পারবেন। এমন এক নেতা হবেন, যিনি সাধারণ মানুষের জজবার বাস্তবায়ন করবেন। পবিত্র ভূমি ও মক্কা-মদিনার হেফাজতের জন্য নিজের সব কিছু বিলিয়ে দেওয়ার জজবা রাখবেন। এমন এক মুজাহিদ হবেন, যিনি জিহাদকে ইবাদাত মনে করবেন এবং তাকেই জীবনের চাওয়া-পাওয়া বানাবেন।

ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে প্রথমে যুদ্ধ শুরু করেন ইমাদুদ্দীন জঙ্গি রহ.। তিনি ক্রুসেডারদের থেকে নিজেদের ভূমি ফিরিয়ে নিতে শুরু করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ৫৪১ হিজরিতে শাহাদাতের পানপাত্র দান করেন। তারপর তাঁর ছেলে নুরুদ্দীন জঙ্গি রহ. এই জিহাদকে এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি একজন আলেম, দুনিয়াত্যাগী ও আবেদ ছিলেন। তাঁর ভেতরে কানায় কানায় জিহাদের স্পৃহা

ভরপুর ছিল। বায়তুল মুকাদ্দাসের আজাদি তাঁর মিশন ছিল। একেই তিনি আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করতেন।

৫৫৮ হিজরিতে বাকিআহর যুদ্ধে ক্রুসেডাররা অকস্মাৎ হামলা চালালে মুসলমানদের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। তখন তিনি কসম করেন, যত দিন বদলা না নিতে পারবেন, তত দিন ছাদের নিচে (ঘরে ফিরে) যাবেন না। সুতরাং খুব জজবা ও উদ্দীপনার সঙ্গে জবাবি হামলা করার প্রস্তুতি নিতে থাকলেন। আলেম-উলামা ও বুজুর্গানে দীনের কাছেও অবস্থা লিখে চিঠি পাঠালেন, যাতে তিনি কাফেরদের জুলুমের কথাও উল্লেখ করেন। উলামায়ে হক কেঁদে কেঁদে সেসব ঘটনা মুসলমানদের কাছে বর্ণনা করেন। ফলে মানুষের মধ্যে জিহাদের ঢেউ ওঠে।

ইতিহাস সাক্ষী, প্রত্যেক যুগে উলামায়ে হক মুজাহিদীনকে সঙ্গ দিয়েছেন। নিজেরা জিহাদের ময়দানে আল্লাহর সৈনিক হিসেবে যুদ্ধ করেছেন। যদি কখনো যেতে না পারতেন তখনো তাঁদের অন্তর জিহাদের ময়দানে ঝুলে থাকত। সাধারণ মুসলমানদের মুজাহিদীনকে সাহায্য করতে উৎসাহিত করতেন।

উলামায়ে হকের উৎসাহে মানুষ পাগলের মতো নুরুদ্দীন জঙ্গি রহ.-এর সহযোগী হতে লাগল। সুলতান নিজের কসম পুরা করলেন। ক্রুসেডারদের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে তাদের ঐক্য ভেঙে তছনছ করলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বড় বিজয় দান করলেন। পঞ্চাশের বেশি শহর কাফেরদের হাত থেকে ছিনিয়ে আনলেন। কিন্তু বায়তুল মুকাদ্দাসের আজাদি অন্য কারো হাতে লেখা ছিল। সুতরাং তিনি ফিলিস্তিনের সব এলাকা ক্রুসেডারদের থেকে মুক্ত করে ৫৬৯ হিজরি/১১৭৪ ঈসায়িতে আসল ঠিকানার দিকে পাড়ি জমান।

তারপর এই জিম্মাদারি তাঁর সিপাহসালার সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী রহ.-এর কাঁধে আসে। সুলতানকে যারা দেখেছেন, তারা বলেন, মনে হয় তাঁকে এ জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছিল যে আল্লাহ তায়ালা তার মাধ্যমে দীনে ইসলামকে মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাস আজাদ করবেন। সুলতান রহ. বায়তুল মুকাদ্দাসের আজাদিকে দিলের ব্যাধিতে পরিণত করে নিয়েছিলেন, যা তাঁকে একটা মুহূর্ত নিশ্চিন্তে বসতে দিত না। আরাম-আয়েশ, দুনিয়ার স্বপ্ন-স্বাধ, ব্যক্তিগত চাহিদা, সব কিছু সুলতান আইয়ুবী রহ.-এর জন্য অর্থহীন হয়ে পড়েছিল। জিহাদই তাঁর আরাম-আয়েশ, জিহাদই তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা। জিহাদের সঙ্গেই তাঁর ভবিষ্যৎ স্বপ্ন প্রতিষ্ঠিত ছিল।

কাজী ইবনে শাদ্দাদ সুলতান সালাহ উদ্দীন রহ.-এর বিশেষ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি লেখেন, জিহাদের মহব্বত ও আকাঙ্ক্ষা তাঁর শিরা-উপশিরায় মিশে গিয়েছিল।

তাঁর অন্তর ও চিন্তা-চেতনাকে বেষ্টন করে নিয়েছিল। জিহাদই তাঁর আলোচ্য বিষয় ছিল। জিহাদেরই সরঞ্জাম তৈরি করতে থাকতেন। জিহাদেরই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তিনি গবেষণা করতেন। এরই জন্য তিনি লোক তালাশ করতেন। এরই আলোচনা ও উৎসাহদাতার প্রতি তিনি মনোযোগী হতেন। এই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য তিনি নিজের সন্তান, পরিবার ও জন্মভূমিকে আলবিদা বলেছেন। সব কিছু ছেড়ে মরুবাসী হয়েছেন। এক তাঁবুর জিন্দেগিতেই সন্তুষ্ট হয়েছেন, যা বাতাসের দরুন এদিক-ওদিক হেলে যেত। কসম করা যেতে পারে, জিহাদের অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে তিনি একটা পয়সাও মুজাহিদীনের সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া অন্য কোনো খাতে খরচ করেননি। *[তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমত খণ্ড-১।]*

অন্য এক জায়গায় কাজী শাদ্দাদ লেখেন, যুদ্ধের ময়দানে তাঁর অবস্থা এমন একজন চিন্তিত মায়ের মতো হতো, যিনি তাঁর একমাত্র বাচ্চাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তিনি এক কাতার থেকে অন্য কাতারে ঘোড়া নিয়ে দৌড়াতে থাকতেন এবং মুজাহিদীনকে জিহাদের ওপর উৎসাহিত করতে থাকতেন। তিনি একাই গোটা ফৌজের মধ্যে বিচরণ করতেন ও হাঁক-ডাক করতেন; হে ইসলামের প্রভু, তুমি ইসলামকে সাহায্য করো। তাঁর চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ত। *[তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমত খণ্ড-১।]*

হাত্তিনের যুদ্ধ চূড়ান্ত যুদ্ধ

ٹل نہ سکتے تھے جو جنگ میں اڑ جاتے تھے
پاؤں شیروں کے بھی میداں سے اکھڑ جاتے تھے
تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے
تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے

টলানো যেত না যা, যুদ্ধে তা উড়ে যেত
সিংহের পা-ও ময়দান থেকে উপড়ে যেত,
তোমার অবাধ্য হতো যে নষ্ট হয়ে যেত
তরবারি কী জিনিস, আমরা তো কামানের সঙ্গে লড়ে যেতাম।

হাত্তিনের যুদ্ধ ৫৮৩ হিজরি/১১৮৭ ঈসায়িতে সংঘটিত হয়। বায়তুল মুকাদ্দাসের বিজয় এবং পরাজয় এই যুদ্ধেই চূড়ান্ত হয়েছিল। সুতরাং ক্রুসেডাররা নিজেদের

সব কিছুই এই যুদ্ধে সংযোগ করেছিল। সুলতান জিহাদের উৎসাহ দিতে দিতে মুজাহিদীনের মধ্যে জোশ ও স্পৃহার আগুনে স্ফুলিঙ্গ ছুটিয়েছিলেন। আল্লাহর বন্ধুদের বাহুতে বিজলি চমকাচ্ছিল। যা যেকোনো সময় আল্লাহর দুশমনদের ওপর ভেঙে পড়ার জন্য উন্মুখ হয়েছিল। প্রত্যেক মুজাহিদ বিজয় অথবা শাহাদাতের তামান্নায় অস্থির ছিলেন। নিজের প্রথম কেবলাকে ক্রুসেডারদের থেকে মুক্ত করার আকাঙ্ক্ষায় বুঁদ হয়েছিলেন। মুজাহিদীন এই যুদ্ধে এমনভাবে লড়াই করেন যে এরপর তাদের বেঁচে থাকা অনর্থক। আল্লাহ তায়ালা মুজাহিদীনকে সাহায্য করেন। মুজাহিদীনকে বিজয় দান করেন। আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল সা.-এর দুশমনকে লাঞ্ছিত এবং অপদস্ত করেন। ইমানদারদের অন্ত রে শীতলতা নেমে আসে এবং মুনাফিকদের কলিজা ফেটে যায়।

যুদ্ধের ময়দানের অবস্থা অবাক করার মতো ছিল। একেকজন মুজাহিদ ৩০ জন ক্রুসেডারকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতেন। তাঁরা যাদের গ্রেপ্তার করেছিলেন তাদের মধ্যে ক্রুসেডারদের বড় বড় কমান্ডারও ছিল। জেরুজালেমের বাদশাহ 'গাঈ'ও তাদের সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়েছিল।

মক্কা-মদিনার ওপর কুদৃষ্টিদাতার পরিণাম

মক্কা-মদিনার ওপর হামলার ইচ্ছা পোষণকারী 'ওয়ালি কর্ক রেজিনাল্ড' আকায়ে মাদানি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলামদের সামনে বন্দি অবস্থায় দণ্ডায়মান ছিল। তার চক্রান্ত ও অহংকার মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী রহ. জেরুজালেমের বাদশাহকে নিজের কাছে বসালেন। তার পিপাসা দেখে তাকে ঠাণ্ডা পানির পেয়ালা পান করতে দিলেন। বাদশাহ পানি পান করে রেজিনাল্ডকে দিয়ে দিলেন। তার ওপর সুলতান রাগান্বিত হয়ে গেলেন এবং বাদশাহ 'গাঈ'কে বললেন, আমি তো তাকে পানি দিইনি। রুটি এবং লবণ যাকে দেওয়া হয়, তাকে নিরাপদ মনে করা হয়। কিন্তু এই লোক আমার প্রতিশোধ থেকে বাঁচতে পারবে না। এ কথা বলে সুলতান রাসুল সা.-এর দুশমনের সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'শুনে রাখ! আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য দুবার কসম খেয়েছি। এক. যখন তুমি পবিত্র মক্কা-মদিনায় আক্রমণ চালানোর ইচ্ছা করেছিলে। দুই. যখন তুমি ধোঁকাবাজি ও গাদ্দারি করে হাজিদের কাফেলার ওপর আক্রমণ করেছিলে। দেখ! এখন আমি তোমার বেয়াদবি ও অপমানের প্রতিশোধ নিচ্ছি।' এ কথা বলে সুলতান রহ. তরবারি

বের করলেন এবং রেজিনাল্ডকে নিজের হাতে কতল করে নিজের কসম পুরা করেন।

বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়

হাত্তিন বিজয়ের কয়েক মাসের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা সেই দিনটিকেও মুসলমানদের দেখালেন, যখন বায়তুল মুকাদ্দাস দ্বিতীয়বার মুসলমানদের দখলে আসে। প্রথমবার হজরত উমর ফারুক রা.-এর খেলাফতকালে জিহাদের মাধ্যমেই বিজয় হয়েছিল। তারপর যখন উম্মত জিহাদ থেকে বিমুখ হয়ে যায়, তখন কাফেররা পুনরায় তা দখল করে নেয়। তারপর ৯০ বছর বায়তুল মুকাদ্দাস কাফেরদের হাতে থাকে। এটা সেই ৯০ বছর যখন উম্মতের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে যুগের বড় বড় মুহাদ্দিস, প্রসিদ্ধ ফকিহ ও ওলিগণ মওজুদ ছিলেন। ইলমি এবং গবেষণার দিক থেকে তা ইসলামী ইতিহাসের সোনালি যুগ ছিল। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজালি, আল্লামা যমখশরি, আবু বকর ইবনে আরাবি, ইবনে আসাকির এবং ইমাম ফখরুদ্দীন রাজি রহ.-এর মতো মহান ব্যক্তিবর্গ এই যুগে বিদ্যমান ছিলেন।

সারকথা হলো, কুফর ও ফেতনার শক্তি ভাঙার জন্য আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের কিতালের আদেশ করেছেন। এই পথ অবলম্বন করেই কুফরের শক্তি ভাঙা যেতে পারে। যেই পথ আল্লাহ তায়ালা নিজের হাবিব সা.-এর জন্য পছন্দ করেছেন, নবীয়ে আখিরুজ্জামান সেই পথকেই নিজের উম্মতের জন্য রেখে গেছেন এবং বলে গেছেন, যদি তোমরা এই পথকে ছেড়ে দাও, তাহলে তোমাদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেওয়া হবে। সেই লাঞ্ছনা তত দিন পর্যন্ত বিজয়ী থাকবে, যত দিন তোমরা জিহাদের পথে ফিরে না আসবে।

এখন যদি উম্মত জিহাদের রাস্তা ছেড়ে অন্য কোনো পন্থায় এই লাঞ্ছনাকে দূর করতে চায়, তাহলে তা কখনোই দূর হবে না। কেননা মুসলমানদের জন্য কামিয়াবি কেবল এবং কেবলই আল্লাহ তায়ালার বিধিবিধান পালনের মধ্যে রয়েছে। যখন যা হুকুম হবে তখন তাই পালন করতে হবে। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির ওপর মাথা ঝোঁকানোর নামই দীন। তা ভিন্ন সব কিছুই শয়তানের ধোঁকা। শব্দ এদিক সেদিক করা, যৌক্তিক দলিল প্রমাণ ও কাদিয়ানি টাইপের প্রশ্ন মানুষের কাছে যতই পছন্দনীয় হোক না কেন, দীন হলো সেই জিনিস, যা মুহাম্মদে আরাবি সা. আমাদের জন্য রেখে গেছেন। সাহাবায়ে কেরামের বাস্তব জীবন যার ওপর সাক্ষী, উলামায়ে হক তার ওপর চলে আমাদের রাস্তা

দেখিয়েছেন। সুতরাং সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী রহ. দীনের সেই অটল বাস্তবতাকে বুঝতেন, যা কাফেরদের শক্তিকে ভাঙতে পারে। নবী সা. বদরের ময়দানে বের হয়ে বিজয়ের জন্য দোয়া করেছেন। সুতরাং সুলতান রহ. বায়তুল মুকাদ্দাসের আজাদির জন্য কিতালকে আবশ্যক মনে করেছেন এবং তারপর উলামায়ে হকের কাছে দোয়ার দরখাস্ত করেছেন।

৫৮৩ হিজরির ২৭ রজব সুলতান বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করেন। বায়তুল মুকাদ্দাসে ৯০ বছর পর জুমার নামাজ হয়। দূর-দূরান্ত থেকে উলামায়ে কেরাম ও সাধারণ মুসলমান গলা ছেড়ে তাকবির দিতে দিতে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে আসতে থাকেন। সেসব লোকের আনন্দের পরিমাপ তারাই করতে পারে, যাদের অন্তরে ইসলামের বিজয়ের তামান্নাগুলো দীপ্তিত হতে থাকে। যাদের চোখ ইসলাম ও মুসলমানদের কাফেরদের শাসন থেকে আজাদ দেখার জন্য অপলক তাকিয়ে থাকে। অন্যথায় যাদের কাছে ইসলাম বিজয়ী হলো নাকি পরাজিত হলো, মুসলমান শাসক হলো নাকি প্রজা হলো–এসবের কোনো দরকার নেই। তাদের জন্য এসব কথা অর্থহীন। তাদের জন্য দুবেলা পেট ভরার নামই জিন্দেগি। চাই তাদের শাসক হিন্দু হোক কিংবা ইহুদি হোক।

সম্মিলিত সেনাদল ও ইসলামের সিংহ সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী রহ.

পক্ষান্তরে বায়তুল মুকাদ্দাসের বিজয়ের সংবাদ কুফরি বিশ্বের ওপর বিজলি হয়ে আছড়ে পড়ে। এই সংবাদ তাদের ভেতরে প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। গোটা ইউরোপ মারার জন্য এবং মরার জন্য তৈরি হয়ে যায়। ইউরোপের সব প্রসিদ্ধ বাদশাহ, শাহজাদা, সিপাহসালার ও সমরবিদরা ময়দানে বের হয়ে আসে। কায়সার, ফ্রেডরিক, রিচার্ড শেরডল ও ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, স্কলিয়া, অস্ট্রিয়ার বাদশা, ডিউক ও নাইটরা সবাই এক ছিল। পক্ষান্তরে তাদের মোকাবিলায় একা সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী রহ. কিছু সঙ্গী নিয়ে ইসলামী বিশ্বের পক্ষে লড়ছিলেন।

ধারাবাহিক পাঁচ বছর রক্তারক্তি যুদ্ধ চলতে থাকে। সম্মিলিত বাহিনী বায়তুল মুকাদ্দাস দখলের জন্য জান-প্রাণ চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার সাহায্যে সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী রহ. তাদের মোকাবিলা করতে থাকেন। ক্লান্ত হয়ে ভেঙে পড়েও বিশ্রামের খেয়ালও অন্তরে আনেননি। নিজের জান বাঁচানো, নেতৃত্বের ফায়দা লোটা ও পরিবারের সঙ্গে জিন্দেগির স্বাদ

নেওয়ার বিনিময়ে ইমানি সম্ভ্রম ও রক্ষকের সওদা করেননি। এ চিন্তাও করেননি যে যদি এই সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে কুলাতে না পারেন, তাহলে তারা মুসলমানদের প্রতিটি ইট খুলে নেবে; বরং অকুতোভয় হয়ে গোটা ইসলামী বিশ্বের পক্ষ থেকে প্রথম কেবলার প্রতিরক্ষা আঞ্জাম দিতে থাকেন।

আজ মুসলমান কোনো একজন সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর স্বপ্ন দেখে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা কোনো সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীকে পাঠিয়ে দিলে তার কদর করে না। এমনকি তাকে সময়ের সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী মনেই করে না। সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী রহ. বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ের যে পথ বেছে নিয়েছিলেন, আজ তারই রুহানি প্রতিনিধি সেই পথে চলে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত পৌঁছার প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছেন। মনে রাখা উচিত, সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী রহ. শুধু একজন বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ীর নাম নয়, তিনি একটি প্রেরণা, তিনি একটি প্রতিজ্ঞা, তিনি হৃদয়ের এক জ্বালার নাম। তিনি মহব্বত ও পাগলামির ওই চূড়া যেখানে আকলের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ। জয়-পরাজয়ের সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক নেই। যারা মুজাহিদীনের ব্যাপারে হক-বাতিলের ফায়সালা করে জয়-পরাজয় দেখে তারা যুক্তিবাদী, তাদের অন্তরে মহব্বতের বাতাসও লাগেনি। শরিয়তের রাজ ও গভীরতা সম্পর্কেও তাদের কোনো ধারণা নেই।

স্মরণ করুন, সায়্যিদুনা নূহ আ. ৯০০ বছর দাওয়াত দিয়েছিলেন, কিন্তু ফলাফল কী পেয়েছিলেন? নাউজুবিল্লাহ! এ ক্ষেত্রে আপনার বিশ্বাস কি এমন যে তিনি ব্যর্থ? তিনি কি হকের ওপর ছিলেন না? প্রকৃতপক্ষে লাভ-ক্ষতি দেখে প্রেম-ভালোবাসা হয় না। পরিণামের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে কেবল হুকুম পালন করে যেতে হয়। যদি হুকুম হয় একমাত্র ছেলের গর্দানে ছুরি চালাতে, তাহলে তৎক্ষণাৎ তা পালন করতে হয়। আকলকে এ কথা জিজ্ঞেস করা যাবে না যে ছুরি চালাব কি না? গর্দান কাটব কি না? বিশদ ইতিহাস। দিলওয়ালারাই কেবল বুঝতে পারবেন। যাদের অন্তরে ইমান বাসা বেঁধেছে তারাই বুঝবেন।

সুতরাং এই উম্মত প্রত্যেক যুগে সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর পথে চলার মতো লোক জন্ম দিচ্ছে। কখনো সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ রহ. (কস্তুনতুনিয়া বিজেতা ১৪৩২-১৪৮১)-এর আকৃতিতে। কখনো আওরঙ্গজেব-আলমগীর রহ. (১৬১৮-১৭০৭)-এর আকৃতিতে। কখনো সিরাজউদ্দৌলা রহ. (১৭৪৯-১৭৯৯)-এর আকৃতিতে। কখনো শহিদ টিপু সুলতান রহ. (১৭৯৯)-এর আকৃতিতে। কখনো সায়্যিদ শহীদ রহ. (১৭৮৬-১৮৩১)-এর আকৃতিতে। কখনো শামেলীর ময়দানের ঘোড় সওয়ারদের আকৃতিতে। শুধু চিন্তাভাবনার কমতি। নতুবা আজও উম্মত বাঁজা হয়ে যায়নি। আফগান জিহাদের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত

বিভিন্ন ভূখণ্ডে উম্মতের মায়েরা কেমন চমকানো হিরাগুলো জিহাদের ময়দানে কুরবানি করে দিয়েছে। ইতিহাস লেখা হলে সবাই স্বীকার করবে। কারণ, মানুষ নিজের যুগের ব্যক্তিত্বদের মর্যাদা না দেওয়াটা বাস্তবতায় রূপ নিয়েছে। তারা শুধু অতীতের সালাহ উদ্দীন রহ.কে জানে। কারণ, তার অবস্থাগুলো তাদের দৃষ্টিতে চমকাচ্ছে।

এটাও একটা প্রশ্ন যে যদি এই যুগে সুলতান সালাহ উদ্দীন রহ. আসেন, তাহলে আমাদের মধ্য থেকে কতজন তাঁর সঙ্গ দেব? সম্মিলিত সেনাবাহিনীর মোকাবিলায় তাঁর সমমনা কতজন মুসলমান পাওয়া যাবে? বর্তমান হুকুমতের অসন্তুষ্টি, চক্রান্তকারী ফেতনা, ব্যক্তিগত বাধা সত্ত্বেও কতজন এমন পাগল পাওয়া যাবে, যারা সবকিছু ছেড়ে বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ের জন্য কোনো আইয়ুবী রহ.-এর সঙ্গে চলে যাবে?

হজরত নূহ (আ.)-এর ওপর ঈমান ও তাঁর নৌকায় আরোহণকারী সম্প্রদায়

মানুষ যখন তার জাগ্রতকারী থেকে দূরে সরে যায় এবং অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী রবের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক শিথিল হয়ে যায়, তখন বাস্তবতার জ্ঞান তার মাথায় ঢোকে না; বরং এমন বিশ্লেষকদের কাছে শয়তানরা আসে, যারা তাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা ঢেলে তাদের চিন্তাগুলোকে অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং তাদের বিবেকগুলোকে নিজেদের কাছে পণবন্দি বানিয়ে ফেলে। কিন্তু যাদের চিন্তা অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী মহান আল্লাহর সঙ্গে রঙিন হয়, আল্লাহ তাদের ও তাদের চিন্তাগুলোকে সঠিক পথের ওপর তুলে দেন। চাই পথ যতই অন্ধকারাচ্ছন্ন হোক।

এ শুধু আজকের কথা নয়। মানবতার ইতিহাস জাহির (প্রকাশ্য ও বাহ্যিক বিষয়াদি) ও বাতিনের (অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি) এসব লড়াইয়ে ভরপুর। হক ও বাতিলের লড়াইয়ে বাতিলের পাতে যেমন বিফলতা আর ব্যর্থতা ছাড়া কিছু পড়েনি, তেমনি জাহিরের ওপর বিশ্বাস স্থাপনকারীরা আজীবনই প্রতারিত হয়ে আসছে। প্রতিজন মানুষের মধ্যে আল্লাহপাক মাথার দুটি চোখের পাশাপাশি অন্তরেরও দুটি চোখ সৃষ্টি করেছেন। মাথার চোখ শুধু জাহির দেখে। পক্ষান্তরে হৃদয়ের চোখ বস্তুর হাকিকত পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে তার মধ্যে উঁকি দিতে সক্ষম। আল্লাহর রাসুল সা. নিজের জন্য আল্লাহর কাছে এ দোয়া করেছেন–

اَللّٰهُمَّ اَرِنِی الْاَشْيَاءَ كَمَا هِیَ

হে আল্লাহ, আমাকে বস্তুরাজির স্বরূপ দেখিয়ে দাও।

মাথার চোখ থেকে বঞ্চিত অতটা করুণার পাত্র নয়, যতটা করুণা পাওয়ার যোগ্য অন্তরের চোখ হারানো ব্যক্তি। কারণ, আপনি মাথার চোখের অন্ধ এমন বহু মানুষ দেখবেন, যারা তাদের সৃষ্টিকর্তার পরিচয় লাভে সফল হয়েছে এবং নিজে কিছু না দেখা সত্ত্বেও শুধু এ জন্য পাপ থেকে বিরত থাকছে যে আল্লাহ তাদের দেখছেন। এর বিপরীতে আপনি মাথার চোখের অধিকারী কত কত মানুষ দেখবেন, যারা সব কিছু দেখা সত্ত্বেও নিজের সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে পারেনি, যারা ইনসানিয়াত (মানবতা) ও শয়তানিয়াতের (শয়তানি চরিত্রে) পার্থক্য জানতে পারেনি। অজ্ঞতা ও জ্ঞানের ব্যবধান উপলব্ধি করতে পারেনি। অন্ধকার ও আলোর তারতম্য ধরতে পারেনি। ফলে সত্যের উজ্জ্বল আলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ইবলিসের অন্ধকার পথগুলোরই পথিক হয়ে গেছে। তাদের মাঝে আপনি চিন্তাবিদও পাবেন, শিক্ষকও পাবেন। বক্তা-খতিবও পাবেন, লাভ-লোকসান হিসাবকারী ব্যবসায়ীও পাবেন। কারণ কী? কারণ হলো, তাদের অন্তরের চোখ অন্ধ হয়ে গেছে এবং তারা বস্তুর বাহ্যিক রূপটাকেই হাকিকত (আসল রূপ) মনে করে বসেছে।

মনে করেন, একটা সম্প্রদায় কোনো এক মরু-অঞ্চলে বাস করে, যেখানে বন্যার কোনোই আশঙ্কা নেই। তাদের মাঝে একজন আছেন খুবই বিশ্বস্ত ও সত্যানুসারী ভালো মানুষ। তিনি ওখানে বড়সড় একটা নৌকা বানাতে শুরু করলেন এবং জনতাকে আগত বন্যা সম্পর্কে সতর্ক করতে লাগলেন। অনুমান করুন, হৃদয়ের অন্ধ লোকেরা এই লোকটির সঙ্গে কিরূপ আচরণ করবে? তারা তাকে নিয়ে ঠাট্টা করবে, তার বিবেক-বুদ্ধি ঠিক আছে কি না সন্দেহ ব্যক্ত করবে, দুষ্ট চরিত্রের লোকদের তার পেছনে লাগিয়ে দেবে। কেন? কারণ, তাদের মাথায় বিদ্যমান চোখ দুটো সর্বত্র কেবলই মরুভূমি দেখছে। যতদূর চোখ যায়, কোথাও কোনো সমুদ্র দেখছে না। কখনো সেখানে বান আসে না। সর্বোপরি এলিট (অভিজাত) শ্রেণির কেউই তাকে সমর্থন করছে না। মোটকথা, অন্তর্চক্ষুর অন্ধ লোকেরা এই নৌকা তৈরির স্বরূপ বুঝতে সক্ষম হবে না।

পক্ষান্তরে যাদের অন্তর্চোখের জ্যোতি বহাল আছে, মাথার চোখের পাশাপাশি অন্তরের চোখও ঠিকঠাক আছে, সুস্থ আছে এবং ওই লোকটির ব্যাপারেও ভালো করেই জানে, তিনি খুবই সজ্জন মানুষ, কখনো কারো সঙ্গে মিথ্যা বলেননি, কারো সঙ্গে কখনো বেইমানি করেননি, সব মানুষের কল্যাণকামিতা তার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এরা তার কথাটি সত্য সঠিক বলে মেনে নেবে এবং বিশ্বাস করবে। ইনি যখন বলছেন, তাহলে ব্যাপার একটা আছে নিশ্চয়। বাহ্যিক

লক্ষণাদি ও বাহ্যিক হিসাব-নিকাশ তার কথা ও আচরণের বিপরীত হলেও আমাদের তাকে মেনে নেওয়া উচিত।

ইতিহাস খোদ একজন বিচারক। ইতিহাস দুধ-পানি আলাদা করে দেখিয়ে দেয়। তো ইতিহাসের রায় অটলই থাকল যে বিবেকের অন্ধরা এই বন্যার পানিতে ভেসে গেছে এবং তাদের নাম-চিহ্ন মুছে গেছে। পক্ষান্তরে অপর শ্রেণিটি এই বান থেকে রক্ষা পেয়ে গেছে এবং ভূপৃষ্ঠে মানববংশ টিকিয়ে রাখার কারণ হয়েছে। এই শ্রেণিটি ছিল হজরত নূহ (আ.)-এর ওপর ইমান আনয়ন করে নৌকায় আরোহণকারী সম্প্রদায়। পক্ষান্তরে যারা নিজেদের চিন্তাশীল, সুশীল ও অভিজাত মনে করত, অস্তিত্বের পাতা থেকে তাদের মুছে দেওয়া হয়েছে। না তাদের পাণ্ডিত্য কোনো কাজে এসেছে, না তাদের Analysis বা সমীক্ষা সেই ওয়াদা হটাতে পেরেছে, যেটি নূহ (আ.)-এর রব তাঁর সঙ্গে করেছিলেন।

আদ জাতির ইতিহাসটাও একটু পড়ে নিন। এমন একটি সম্প্রদায়, যারা স্থাপত্য শিল্পে উন্নতির শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছিল এবং স্থাপত্যবিষয়ক সব ধরনের নিরাপত্তার আয়োজন সম্পন্ন করে নিয়েছিল। না কোনো শত্রুগোষ্ঠীর তাদের সেই স্থাপনাগুলোর অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশের সুযোগ ছিল, না বাইরে থেকে কারো তাদের কোনো ক্ষতি করা সম্ভব ছিল। মোটকথা, তাদের স্থাপনা ও স্থাপত্যশৈলীতে কোনো প্রকার ত্রুটি বা ফাঁকফোকর ছিল না। বাহ্যিক বিচারে তারা ছিল পুরোপুরি নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত।

এ অবস্থায় যদি তাদের বলা হয়, তোমাদের তোমাদেরই এই সুউচ্চ ও পর্বতসম অট্টালিকাগুলোর মধ্যেই ধ্বংস করে দেওয়া হবে, তখন যারা সেই ভবনগুলো বাহ্যিক চোখে দেখবে, তারা এবং তাতে ব্যবহৃত উপাদানগুলোর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষকরা এ কথাটি কী করে বিশ্বাস করবে!

কিন্তু ইতিহাস এখানেও তাদের অন্ধ প্রমাণিত করেছে এবং আদ জাতিকে তাদের সব ধরনের উন্নতি, স্থাপত্যশিল্পে চূড়ান্ত যোগ্যতা, ভূমিকম্পসহনীয়, ঝাঁকুনি সহনীয় ও সব ধরনের বিপদ থেকে মুক্ত স্থাপনা সত্ত্বেও তাদের সেই প্রাসাদগুলোতেই শিক্ষার উপকরণ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেগুলোর জন্য তাদের বেশ অহমিকা ছিল। অথচ মহান আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের ওখান থেকে বের করেও মারতে পারতেন। কিন্তু এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করে তিনি কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষগুলোকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, তোমাদের সমীক্ষা কতগুলো বর্ণ ও শব্দের গাঁথুনি ছাড়া আর কোনো তাৎপর্য বহন করে না।

বস্তুবাদী নমরুদ ও
আমাদের জাতির পিতা হজরত ইবরাহিম (আ.)

আমাদের জাতির পিতা ও নেতা হজরত ইবরাহিম (আ.)কে নমরুদ জ্বলন্ত আগুনের কুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল এবং বস্তুবাদী নমরুদ ও তার দোসররা ধরে নিয়েছিল, আমরা আমাদের উপাস্যদের সঙ্গে বিদ্রোহকারী ইবরাহিমকে আগুনে ফেলে তার হাড়গুলো পর্যন্ত পুড়িয়ে ছাই বানিয়ে দিয়েছি। কিন্তু বাস্তবতা কী ছিল? আসল ঘটনা কী ছিল? ছিল মাথার চোখে দেখা চিত্রের একদম উলটা।

আল্লাহর শত্রু ও তাঁর প্রিয় নবীগণের ঘাতক ইহুদিরা হজরত ঈসা (আ.)কে শুলে চড়িয়ে মনে করেছিল, আমরা তাঁকে ফাঁসি দিয়েছি। কিন্তু এটা ছিল তাদের বাহ্যিক চোখের ধোঁকা এবং আজও পর্যন্ত তারা সেই ধোঁকার মধ্যেই লিপ্ত। কিন্তু যাদের অন্তরের চোখ ছিল, আল্লাহ তাদের ছয় শ বছর পর বলে দিয়েছেন, তাকে শূলিতে চড়ানো হয়নি; বরং তাকে আকাশে তুলে নেওয়া হয়েছে। অন্ত র্চক্ষুর অধিকারীরা এই তথ্য মেনে নিয়েছে। অথচ তারা মাতার চোখে এসবের কিছুই দেখেনি। পক্ষান্তরে মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিক ও এলিট শ্রেণি শুধু এ জন্য প্রতারিত হয়েছিল যে তারা অন্তরের চোখ থেকে বঞ্চিত ছিল। তারা কখনো অন্তর্চক্ষুকে জ্যোতির্মান বানানোর চেষ্টাই করেনি।

মাথা বড় আবু জাহেল

আবু জাহেল যার মাথাটাও বেশ বড়সড় ছিল এবং জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতায় যার বেশ অহমিকা ছিল। মুহাম্মদ সা.-এর এক রাতে সামান্য সময়ের জন্য আকাশে চলে যাওয়া এবং মহান আল্লাহর সঙ্গে দেখা করে আসার সংবাদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারল না। কারণ কী? কারণ তার বিবেক মেনে নিতে পারছিল না, এত দীর্ঘ পথ ভ্রমণ কোনো বাহন ছাড়া কোনো মানুষ এত দ্রুত অতিক্রম করতে পারে। ফলে সে অস্বীকার করে বসল। মশকরা শুরু করে দিল। মনে মনে ভাবল, মানুষকে মুহাম্মদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলার, তার থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার মোক্ষম সুযোগ একটা হাতে পেয়েছি। এই সুযোগ কোনোমতেই হাতছাড়া করা যাবে না। অন্তুর্চক্ষুওয়ালা একজনকে জিজ্ঞেস করে বসল, একলোক বলছে, সে নাকি রাতে সব আকাশ ভ্রমণ করে এসেছে এবং

তার রবের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎও করে এসেছে। আচ্ছা, বলো তো; এই লোক সম্পর্কে তোমার ধারণা কী? এটা কি সম্ভব?

জানেন সেই অন্তর্চক্ষুওয়ালা লোকটি কে?

তিনি আর কেউ নন, তিনিই হলেন সেই মহান ব্যক্তি, যিনি রাসুলের নবুওয়াতের সংবাদ শুনে এক বাক্যে বলেছিলেন, আপনি যা বলেছেন তা সবই সত্যি। আমি ইমান আনলাম আপনার প্রতি এবং মহান আল্লাহ ও আল্লাহর সব কিছুর প্রতি। আর যখন তাঁকে আবু জাহেল এ প্রশ্নটি করলেন যে দেখ তো সে সত্যি বলছে কি না? তখন অন্তর্চক্ষুওয়ালা হজরত আবুবকর (রা.) তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন কে বলেছে কথাটি?

আবু জাহেল বলল; কে আর হবে বুঝ না! তোমার দোস্ত।

মানে মুহাম্মদের কথা বলছেন? হ্যাঁ, তোমার দোস্ত মুহাম্মদই এ কথা বলছে, সে নাকি সবকিছুই একরাতের মধ্যে সেরে ফেলেছে।

হজরত আবুবকর (রা.) একটি পলকও চিন্তা করলেন না। ঝট করে বলে ফেললেন, আমার বন্ধু যখন বলেছেন, তাহলে ঘটনা শতভাগ সত্য। এটি বলার কারণ, ব্যাপারটা ছিল হৃদয়ের, বিবেকের নয়। হজরত আবুবকর (রা.) বললেন, আমার বন্ধু কখনো মিথ্যা বলেন না। তিনি যদি এমনটি বলে থাকেন, তাহলে ঘটনা এমনই। এতে এক বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

অন্তর্চক্ষুবঞ্চিত হৃদয়ান্ধ আবু জাহেল আরো অন্ধকারে ডুবে চলল, আর বিশ্বাসী আবুবকর 'মহাবিশ্বাসী' মুমিনে পরিণত হয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য এমন আলোকিত হলেন, যে তাঁর সংস্পর্শে এলো, সে আলোকিত হয়ে গেল আর যে তাকে ঘৃণা করল, তার অন্তর কালো হয়ে গেল। তারপর সুরা রুমের শুরুর দিককার আয়াতগুলো নাজিল হলো, যেগুলোতে রোমের ওপর পারস্যের বিজয়ী হওয়ার ঘোষণার পর বলা হয়েছে, রোমানরা পরাজিত হওয়ার অল্প সময় পর আবার বিজয়ী হবে। এই আয়াতগুলো এমন একটি সময়ে নাজিল হলো, যখন 'জমিনি বাস্তবতা' ছিল, পারসিকরা রোমানদের পুরোপুরি পরাস্ত করে ফেলেছে, তাদের থেকে শাম অঞ্চলকে ছিনিয়ে নিয়েছে এবং রোমানদের রাজধানী কস্তনতুনিয়া (ইস্তাম্বুল) ফারসিকদের দ্বারা অবরুদ্ধ।

এমনি সময়ে কুরআন ঘোষণা করল, অচীরেই রোমানরা ফারসিকদের ওপর জয়ী হয়ে যাবে। যাদের চোখ দুনিয়ার বাহ্যিক অবয়ব ভেদ করে সম্মুখে জয়ী হয়ে যাবে। যাদের চোখ দুনিয়ার বাহ্যিক অবয়ব ভেদ করে আর সম্মুখে অগ্রসর হতে জানে না, তাদের কাছে বিষয়টি অদ্ভুত ও অবাস্তব বলে প্রতীয়মান হলো। কিন্তু

যাদের হৃদয় আলোকিত ছিল, যারা শুধু দুনিয়ার বাহ্যিক অবস্থা দেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরিবর্তে অন্তরের চোখে দেখা বাস্তবতাকে সামনে রেখে বিশ্লেষণ করে, ঘোষণাটিতে তাঁদের এতখানি বিশ্বাস ছিল যে তাঁদের একজন কাফেরনেতা উবাই ইবনে খালফের সঙ্গে বাজি ধরলেন, যদি সাত বছরের মধ্যে রোমানরা ফারসিকদের ওপর বিজয়ী না হয়, তাহলে তোমাকে সাতটা উষ্ট্রী দেব। (তখনো পর্যন্ত বাজি ধরা হারাম হয়নি)

ইনি ছিলেন হজরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)। ফিরে এসে তিনি আল্লাহর রাসুল সা.কে বিষয়টি অবহিত করলেন। নবীজি বললেন, কুরআনে ফারসিকদের ওপর রোমানদের জয়ী হওয়ার মেয়াদকাল বর্ণনা করতে 'বিজউন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ দশের কম। কাজেই তোমার সাত বছরের সময়সীমা দেওয়া সঠিক হয়নি। তুমি বাজির মেয়াদকাল দুই বছর বাড়িয়ে নয় বছর করে দাও, আর বাজির সংখ্যাও বাড়াও।

হজরত আবুবকর (রা.) ফিরে গিয়ে উবাই ইবনে খালফকে বললেন, আমি সময় আরো দুই বছর বাড়াচ্ছি, আর বাজির সংখ্যা দশের পরিবর্তে এক শ করে দিলাম। উবাই ইবনে খালফ জগতের জমিনি বাস্তবতা ভেদ করতে অক্ষম ছিল। তখন রোমানদের যে শোচনীয় অবস্থা ছিল, তাতে নয় বছর কেন, এক শ বছরেও তারা ফারসিকদের ওপর জয়ী হতে পারবে—এমন ধারণা করা সম্ভব ছিল না। বিজয়ী হওয়া তো দূরের কথা, নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই তাদের পক্ষে কঠিন বলে মনে হচ্ছিল। ফলে উবাই নিশ্চিত মনে বাজিটা লুফে নিল। অপরদিকে হজরত সিদ্দিকে আকবর (রা.) ছিলেন তারও চেয়ে বেশি নিশ্চিন্ত যে আল্লাহর রাসুল সা. যখন বলেছেন, তখন এই ভবিষ্যদ্বাণী কোনোমতেই ভুল হতে পারে না, জমিনি বাস্তবতা যেমনই হোক। তারপর জগত দেখেছে, এখানেও অন্তর্চক্ষুওয়ালাদের সমীক্ষাই সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। বিপরীতে অন্ত র্চক্ষুবঞ্চিত বস্তুবাদে বিশ্বাসীদের কপালে জুটেছে লাঞ্ছনা আর বিফলতা।

সিলা পর্বত

জাহির ও বাতিনের এই দ্বন্দ্বের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। যতখানি লম্বা হক ও বাতিলের ইতিহাস। চৌদ্দ শ বছর আগে মদিনার লাগোয়া পর্বত, যাকে সিলা পর্বত বলা হয়—এই ক্ষুদ্র ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বশেষ প্রতিরক্ষা। তারই সামনের দিকটায় পরিখা খনন করা হচ্ছে। ক্ষুধা ও ক্লান্তিতে কাতর সেনাপতি ও সৈনিকরা শক্ত মাটির বুক চিরে তাকে নিজেদের প্রতিরক্ষা রেখা বানাতে

চাচ্ছেন। রাষ্ট্রটির ওপর তার শত্রুরা আক্রমণ করতে এসেছে এবং চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। তারা প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছে, এই নতুন ধর্ম ও তার অনুসারীদের এই মাটিতেই দাফন করে চিরকালের জন্য অস্তিত্বের পাতা থেকে মুছে দেবে। মদিনার ভেতরে অবস্থানরত মুনাফিকরা বগল বাজাচ্ছে, এবার মুসলমানরা বুঝবে মজা। আমরা কত বুঝিয়েছি, এমন শক্তিশালী জাতিগুলোর শত্রুতা ক্রয় করা বুদ্ধিমত্তার দাবি নয়। কিন্তু আবেগ দ্বারা তাড়িত হয়ে তারা জমিনি বাস্তবতার প্রতি তাকানোর সময় পায়নি। তাদের ধর্ম তাদের ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে এবং তাদের আমির তাদের মেরেই ফেলেছে। এবার দেখব, তাদের বাঁচায় কে!

অপরদিকে বাহিনীর সেনাপতি বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ সা. হাতে কোদাল নিয়ে পরিখা খননের কাজে ব্যস্ত। কোদালের একটা আঘাত শক্ত একটা পাথরের ওপর পড়ল। অমনি তার থেকে আলো বিচ্ছুরিত হলো। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ থেকে রোম বিজয়ের সুসংবাদ বেরিয়ে এলো। পরক্ষণে আরেকটি আঘাত গিয়ে পতিত হলো অন্য একটা পাথরের গায়ে। তার থেকেও আলোর বিচ্ছুরণ ঘটল। এবার নবীজি বললেন, কেসরার ধনভাণ্ডার আমাকে দান করা হলো।

দেখেন জমিনি বাস্তবতা কী, আর আল্লাহর রাসুল বলছেন কী! বস্তুবাদীরা এখানেও সরব হলো। সমীক্ষা ও বিশ্লেষণের স্তূপ জমিয়ে তুলল। কিন্তু অন্ত র্চক্ষুওয়ালারা বিষয়গুলো এমনভাবে বিশ্বাস করে নিল, যেন তারা সব কিছু চোখে দেখেছে। কিন্তু অন্তর্চক্ষুওয়ালারা যা কিছু দেখেছিল, পরে দুনিয়াও তা-ই দেখেছে। রোম ও পারস্য মুহাম্মদ সা.-এর অনুসারীদের পদানত হয়েছিল। অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ওখানকার অলিগলি ইসলামের আলোতে উদ্ভাসিত হয়েছিল।

তো আজ যদি কোনো অন্তর্চক্ষুওয়ালা, নবীজি সা.-এর উম্মতকে নিপীড়ন ও জুলুমের হাত থেকে বাঁচানোর লক্ষ্যে নিজের ভোগ-বিলাস ও সুখ-আরাম কুরবানকারী এমন কোনো কথা বলে, যে কথা বস্তুবাদীদের কাছে পাগলের প্রলাপ বলে প্রতীয়মান হয়, তাহলে কি ইমানদাররাও তাদের বক্তব্য এই বলে মেনে নেবে যে তোমার কথা যুক্তিতে টেকে না, বাস্তবতা ও লক্ষণ তোমার দাবির পক্ষে সমর্থন জোগায় না? আল্লাহর পথে নিবেদিত মুজাহিদদের ভবিষ্যদ্বাণী কি সেই লোকগুলোও সত্য বলে স্বীকার করে নেবে না, যাদের অন্তর নবুওয়াতের আলোতে আলোকিত? শুধু কি এ জন্য যে বস্তবাদীদের জিহ্বা অনেক লম্বা এবং তারা তাদের প্রোপাগাণ্ডার মাধ্যমে ইসলামকে অস্তিত্বের পাতা থেকে মুছে ফেলতে চায়? আপনারা কি এখনো হতাশা আর ভয়ের দীর্ঘশ্বাস

ফেলতে থাকবেন? দাজ্জালি মিডিয়ায় প্রকাশিত ও প্রকাশমান অবজ্ঞামূলক মিথ্যা পর্যালোচনা ও ইহুদিদের মনগড়া বিশ্লেষণের মাধ্যমে কি মুজাহিদদের সেই কীর্তিগুলোকে লুকানো যাবে, যেগুলো তারা আগুনের দরিয়া ও রক্তের সাগর পাড়ি দিয়ে আঞ্জাম দিয়েছে? আমাদের কি ইহুদিদের সেই বেতনখোর টিভি চ্যানেল ও বুদ্ধিজীবীদের কথা মেনে নিতে হবে, যারা মুজাহিদদের ব্যাপারে আলিফ-বার জ্ঞানও রাখে না, আর সেই পাকা ইমানদার মুসলমানের কথা প্রত্যাখ্যান করতে হবে, যিনি বিশ্ববাসীর সম্মুখে ঘোষণা করছেন, এই কির্তি মুহাম্মদ সা.-এর গোলামরা আঞ্জাম দিয়েছে?

ওহে ইমানদাররা, অবশেষে এমনটা হলো কেন? একজন মুমিনের সত্য কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে কেন আপনারা কাফেরদের মিথ্যা ও বানানো বিশ্লেষণের চক্করে ফাঁসছেন? অন্তরের চোখ দুটোকে জ্যোতির্ময় বানিয়ে দেখুন। দুনিয়া বদলে যাচ্ছে। দুনিয়ার শক্তি বদলে যাচ্ছে। যুগের ফেরাউন এই গতকালও পর্যন্ত যে মুজাহিদদের কোনো পাত্তাই দিত না, আজ এই যুদ্ধে তাদের প্রতিপক্ষ স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে।

ওহে তরুণ-যুবকের দল, যুগ পাশ বদল করছে। কালকের মজলুম যে জুলুম সইতে সইতে জুলুমকেই নিজের ভাগ্য ও লিপি মনে করে বসেছিল, আজ তাদের হাত জালেমদের ঘাড়ে ও জালেমরা আজ তাদের হাতে নিত্য জবাই হচ্ছে।

ওসমানি খেলাফতের শেষ সময়গুলো

ইসলামপন্থী ও ইসলামবিরোধীদের এই দ্বন্দ্ব এই আজই শুরু হয়েছে এমন নয়; বরং বেশি পেছনে না গিয়ে হলেও বলা যায়, ওসমানি খেলাফতের শেষ সময়গুলোতে এই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর শুরুটা ছিল ইসলামী বিশ্বের অসহায়ত্ব ও অধঃপতনের পরিসমাপ্তি। ইসলামী বিশ্বের পতনের পাশাপাশি মুসলমানদের মাঝে হতাশা, আত্মবিশ্বাস ও অনৈতিকতাও তুঙ্গে উঠে গিয়েছিল। এই সময়টাকে মুসলমানদের মাঝে ঘাপটি মেরে থাকা ইসলামবিরোধী শক্তিগুলো মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার মোক্ষম সুযোগ মনে করল। তাদের হৃদয়মাঝে লুকিয়ে থাকা কপটতা, ইসলামবিদ্বেষ ও ইসলামবিরোধিতা দুঃসাহসী হয়ে উঠল। ইসলামবিরোধিতার আগুনকে শীতল করার জন্য তাদের কাছে বড় বড় দলিল ও অনেক অনেক কথা ছিল। তারা অতি অনায়াসে নিজেদের অযোগ্যতা, কাপুরুষতা, আত্মমর্যাদাহীনতা ও বেইমানির সব আবর্জনা ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার মাথায় রাখল। ইউরোপ ও আমেরিকার

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে ডিগ্রি নিয়ে আসা লোকেরা ইসলাম ও ইসলামী আইনের বিরুদ্ধে নতুন নতুন স্লোগান তুলতে এবং প্রমাণ উপস্থাপন করতে শুরু করে দিল এবং ইহুদিদের পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের বিকৃত ইসলামকে মুসলমানদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার মিশন নিয়ে মাঠে নামল। কিন্তু তাদের মোকাবিলায় ইসলামপন্থীদের প্রতিরোধ ছিল খুবই দুর্বল। সর্বোপরি ইসলামী বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতিও ছিল হতাশাজনক। ফলে ইসলামবিরোধীরা মনে করল, এবার মুসলিম বিশ্বে আমাদের উপস্থাপিত ইসলাম চলবে। এই ইসলামে মুক্তচিন্তা, স্বাধীনতা ও ধর্মরিপেক্ষতা ধারার শাসন বাস্তবায়িত হবে। এর জন্য ইহুদিরা অত্যন্ত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করল, যা কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামী বিশ্বের ইতিহাসের কপালে কলঙ্কতিলক হয়ে থাকবে। এই ধারার প্রধান পুরুষ ছিল আতাতুর্ক মোস্তফা কামাল পাশা। ইসলামী বিশ্ব, বিশেষ করে তুরস্কে তখন গোপন ইহুদি আন্দোলন 'ফ্রিমেসন'-এর ক্রমবর্ধমান প্রভাবের ফলে আতাতুর্কের সামনে কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিল না।

গায়ের বলে, শক্তির জোরে ইসলামবিরোধীরা এই নতুন ইসলামকে পরিচিত করাতে চাইল, যা কিনা অনেকাংশেই ইহুদিদের বিকৃত ধর্মের সঙ্গে মিল খায়। তাদের এই 'নতুন ইসলামের' ভিত্তি তৈরি করা হলো জৈবিক কামনা-বাসনার ওপর। মনের চাহিদাগুলো তাদের জন্য দলিল, তাদের মন তাদের মুফতি, মদের নেশায় বুঁদ অবস্থায় তাদের মুখনিঃসৃত শব্দমালা তাদের জন্য শরিয়তের স্থান দখল করে নিয়েছিল।

এই তথাকথিত মধ্যপন্থী ও মুক্তমনা লোকগুলোর সহনশক্তি ও কট্টরপন্থার অবস্থা এই ছিল যে তাদের নামাজ সহ্য হলো না। তাদের কানগুলো আরবি ভাষায় আজান শোনা বরদাশত করতে পারল না। আরবিলিপি তাদের মনে আগুন ধরিয়ে দিল।

এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বয়স আজ এক শ বছর হতে চলল। এখনো সেই স্লোগান, সেই ধরন, সেই একই ধারায় প্রমাণ উপস্থাপন। সবই আগের মতো। সেই ফেরাউনি চরিত্র। নিজের কথা মানানোর জন্য, নিজের মত প্রতিষ্ঠার জন্য সেই নিপীড়ন, সেই জেল-জুলুম। যে তাদের বিরোধিতা করছে, কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে তাদের উত্তরে দলিল পেশ করছে, তাকে আজীবনের জন্য গুম করে ফেলা হচ্ছে। নিজের থিওরি চাপিয়ে দিতে কারাগারে আটক করে এমন নির্যাতন চালানো হচ্ছে যে শয়তান নাচতে শুরু করে। এরা আজও মনে করছে, জুলুম-নিপীড়নের মাধ্যমে নিজেদের গড়া 'নতুন ইসলাম' মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দিতে সক্ষম হবে।

অবশ্য তখন ও এখনের মধ্যে কিছু পার্থক্যও আছে। উনবিংশ শতাব্দীর সূর্য অস্তমিত হলো তো ইসলামপন্থীদের মান-মর্যাদাও সঙ্গে করে নিয়ে ডুবল। তারপর যখন বিংশ শতাব্দীর সূর্য উদিত হলো, তখন সে ইসলামবিরোধীদের জয়ের সুবার্তা নিয়ে উদিত হলো। ইসলামপন্থীদের আশার ভোরের পথে দীর্ঘ একটা কালো রাত অন্তরায় হয়ে গেল, যা কিনা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েই চলল।

কিন্তু একটি রাত যতই দীর্ঘ হোক না কেন, একসময় তাকে পোহাতেই হয় এবং ভোরের আলো ফুটতেই হয়। বিংশ শতাব্দীর সূর্য যেভাবে ইসলামবিরোধী ও ইসলামের শত্রুদের জন্য একটা নতুন সকাল নিয়ে উদিত হয়েছিল, তেমনি একবিংশ শতাব্দীর সূর্য ইসলামপন্থীদের জন্য অনুরূপ একটি সকাল নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল যে স্বল্পদৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন লোকেরাও স্পষ্ট দেখল, আশার ভোর উদিত হয়ে গেছে। উনবিংশ শতাব্দীর তিরোহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের সর্বশেষ আশাটিও (১৭৯৯ সালে টিপু সুলতান শহীদ রহ.-এর শাহাদাতের মাধ্যমে) নিজের সঙ্গে করে নিয়ে গেল। পক্ষান্তরে বিংশ শতাব্দীর অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামবিরোধীদের মুখে। (আফগান জিহাদ ও আফগানিস্তানে ইসলাম প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে) কুলুপ এঁটে গেল এবং এই উম্মতের অন্তরে আশার ভোরের নতুন কিরণ জেগে উঠল।

একবিংশ শতাব্দী বিংশ শতাব্দী নয়। ওখানে একটা পরাজিত, পরিশ্রান্ত ও আশাহত জাতি ছিল। এখানে আছে বিজয়ী, তরতাজা ও নানা আশার সমুদ্রে হাবুডুবু খাওয়া একটি জাতি। ওখানে ইসলামবিরোধীরা ও জাতির বিবেকহীন বিশ্বাসঘাতকরা যা চেয়েছিল, করেছিল। মুসলিম বিশ্বকে ইসলামের শত্রুদের কলোনিতে পরিণত করে দিয়েছিল এবং মুসলিম বিশ্বের মর্যাদা ও প্রতাপকে ইহুদি দাসীদের চুলের বেণিতে বেঁধে দিয়েছিল যে জিজ্ঞেস করার কেউ ছিল না। কিন্তু এখানে তেমন হতে পারছে না।

এখন যদি কোনো দিন আমাদের ঘরে চুলায় আগুন না জ্বলে, তাহলে রুটি ঘাতকদেরও কপালে জোটে না। শোকের মাতম যদি আমাদের ঘরগুলোতে হয়, তাহলে তাদের ঘরেও আমরা উৎসব হতে দিই না। আমাদের বাড়িঘর যদি অগ্নিদগ্ধ হয়, তাহলে যারা আমাদের ঘরে অগ্নিসংযোগ ঘটায়, তাদেরও ঘর ভস্মীভূত হয়। আমরা যদি বিচলিত হই, বিমর্ষ হই, তাহলে তাদেরও শান্তিতে থাকতে দিই না। তুষারকবলিত রাতে আমরা যদি ঘুমোতে না পারি, তাহলে নিদ্রা তাদের থেকেও বহু দূরে অবস্থান করে। আমরা যদি বাস্তুহারা, ভিটেমাটিহারা হয়ে থাকি, তাহলে আপন ঘর-বাড়ি, স্ত্রী-সন্তানদের দর্শন তাদেরও নসিব হয় না। হিসাব এখন দুই তরফা চলছে। কখনো তারা আগে,

আমরা পেছনে, কখনো বা আমরা আগে, তারা পেছনে। আর আমরা ইনশাআল্লাহ তাদের ধাওয়া করতেই থাকব। অবশেষে আমরাই সফল হব। কারণ আমরা আমাদের রবের কাছে এমন শক্তি ও সাহায্যের আশা রাখি, যা কাফেরদের কপালে জুটবার মতো নয়।

পৃথিবীর পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি বোঝা জরুরি। ইসলামের শান ও মর্যাদার সূর্য উদিত হয়েছে। ভারত-আমেরিকার চামচিকাগুলো সূর্যকে মন্দ বলায় তাতে গ্রহণ লাগবে না।

হযরত আবদুল্লাহ জুলবাজ্জাদাইন রা.

হজরত আবদুল্লাহ যুলবাজ্জাদাইন রা.-এর নাম তো শুনেছেন, তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত সাহাবি। তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী খুবই কঠিন। একেবারে ছোট বেলায় অর্থাৎ বাল্যকালেই হজরত আবদুল্লাহ যুলবাজ্জাদাইন রা. তাঁর বাবা হারান। তাঁর বাবাকে হারিয়ে তিনি চাচার কাছে বড় হতে থাকেন। একসময় যখন তিনি একটু বড় হয়ে উঠলেন তখন তাঁর চাচা তাকে দিয়ে কাজ-কর্ম করাতেন, ছাগল চরাতেন। মাঠে-ময়দানে কাজ করাতেন, তিনিও চাচার কথামতো সবকিছুই ঠিকঠাকমতো করে যেতে থাকেন। সবদিক দিয়ে তিনি তার চাচার খুব বিশ্বস্তও হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু এই বিশ্বস্ততাও একদিন ভেঙে গেল, যখন তিনি সত্যের পথের ডাক পেলেন, বিজয়ের পথের আহ্বান পেলেন, সন্ধান পেলেন সৃষ্টিকর্তার। একদিন ডাক পেলেন ইমানের। ইসলামের ডাক পেয়ে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন নবী করিম সা.-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন এবং দীন ইসলাম কবুল করবেন। এটিই ছিল তার অপরাধ এত বিশ্বস্ত চাচার কাছে। তারপর তিনি কী করলেন...! তার মন তো মানছে না। তিনি সোজা চলে গেলেন চাচার কাছে। হিসাব-নিকাশ বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। দিয়েও দিলেন। আর বললেন, চাচা, আমি আর আপনার রাখালি করব না। আমি ইসলাম গ্রহণ করতে যাচ্ছি রাসুল সা.-এর কাছে। অতএব আমাকে মুক্তি দিন। চাচা কিছু সময় চুপ করে থেকে বললেন, শোন, তোমার পরনে যে কাপড় আছে তাও কিন্তু আমার...! অতএব চলেই যেহেতু যাবা, ওগুলোও দিয়ে যাও। কত নিষ্ঠুর চাচা...! অবাক করা কথা তাই না! চাচা তাই করলেন, তাঁর সব কাপড় কেড়ে নিয়ে তাকে উলঙ্গ করে তাড়িয়ে দিলেন। কোনো প্রকারে হজরত আবদুল্লাহ যুলবাজ্জাদাইন রা. তাঁর মায়ের কাছে গেলেন। মা তাঁকে একটা কম্বল দিলেন। আর আবদুল্লাহ যুলবাজ্জাদাইন রা. কম্বলটাকে টান দিয়ে দুটো ভাগ করে একটা পরলেন, আরেকটা গায়ে দিয়ে সোজা হাজির হলেন নবীজি সা.-এর দরবারে। নবীজি

তাঁকে জরিয়ে ধরে ইসলামের কালিমা পড়ালেন। এরপর তিনি সেখানেই বাকি জীবনটা নবীজির খেদমতে কাটিয়ে দিলেন। তিনি দুটি কম্বলকে সম্বল করে নবীজির দরবারে চলে এসেছিলেন বলে তাঁর উপাধি হয়ে যায় বাজ্জাদাইন, অর্থাৎ দুই কম্বলওয়ালা। তিনি নবীজির উপাধিতে ভূষিত হয়ে গেলেন আর কী দরকার বলেন।

হযরত খুবাইব রা.

আপনারা নিশ্চয় হজরত খুবাইব রা.-এর ঘটনা শুনেছেন। তাঁকে শূলে চড়ানো হয়েছে। চারদিক থেকে তীর-বর্ষা তাকে বিদ্ধ করতে আরম্ভ করেছে। ধৈর্য ও সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করছেন নির্যাতনের। ভয়ংকর নির্যাতনের সময় তাঁকে বলা হলো, তোমার জায়গায় যদি তোমার নবী হজরত মুহাম্মদ সা.কে স্থাপন করা হয় তাহলে তুমি কি রাজি আছ? তিনি ব্যাথিত কণ্ঠে, প্রত্যয়ের সঙ্গে উত্তর দিলেন, এত বড় কথা। যদি আমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়, আর তার পরিবর্তে হজরত সা.-এর পায়ে একটি কাঁটাও ফোটে, আমি তাতেও রাজি নই।

বলুন তো, এটা ইসলামের সুরত ছিল? ইসলামের ছবি ও চিত্রই কি হজরত খুবাইব রা.-কে শূলের মঞ্চে এই পাহাড়ময় দৃঢ়তা দান করেছিল, না তাঁর মধ্যে ছিল ইমানের প্রকৃত শক্তি। ইমানের এই দৃঢ় শক্তিই তাদের সব যন্ত্রণা, কষ্ট, সব ঘা ও ক্ষতস্থানে ধৈর্যের ও জয়ের প্রলেপ মেখে দিত। প্রতিটি আঘাত আর কষ্টের মুহূর্তে তাদের চোখে ভেসে উঠত বেহেশতের ছবি। সে ছবি যেন বলে দিত তোমার এই কষ্ট-যন্ত্রণা তো কয়েক মুহূর্তের জন্য। অথচ এর অনন্ত-অসীম প্রতিদান তোমার বেহেশতে অপেক্ষমাণ। আল্লাহর রহমত তোমার পথ চেয়ে আছে। এই ছিল আল্লাহর রাসুলের প্রতি ভালোবাসা। তাই যখন তাকে বলা হয়েছিল, তোমার স্থানে আল্লাহর রাসুলকে স্থাপন করতে প্রস্তুত? তুমি কি রাজি? তখন তাঁর সামনে হজরত নবী করিম সা.-এর চেহারা মোবারক বাস্তব রূপ ধরে উপস্থিত। তিনি তখন সহ্য করতে পারেননি, তাঁর পবিত্র কদমে একটি কাঁটা পর্যন্ত ফোটার কথাও।

হজরত আবু সালমা রা. মক্কা ছেড়ে মদিনায় যাচ্ছেন। মক্কার কাফেররা তাঁর পথ আটকে ধরল। বলল, তুমি যেতে পারো। কিন্তু তোমার স্ত্রী উম্মে সালমা আমাদের মেয়ে, ওকে তুমি নিয়ে যেতে পারবে না। আবু সালমা রা. পড়লেন

দ্বিধায়। একদিকে স্ত্রীর ভালোবাসা, অন্যদিকে ইসলামের হাকিকত। তাঁর মনে ইসলামের হাকিকত এতই দৃঢ় ছিল যে তিনি তাঁর স্ত্রীকে আল্লাহর হাতে ছেড়ে চলে গেলেন মদিনায়। হ্যাঁ, এমনই ছিল তাঁদের দৃঢ় ও প্রগাঢ় ইসলামের প্রতি ভালোবাসা। ইসলামের জন্য তাঁরা অকাতরে সব কিছুকে বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কারণ তাঁদের মধ্যে ছিল ইসলামের প্রকৃত ভালোবাসা। আর আজ আমরা স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, অর্থ-সম্পদ অথবা মান-সম্মান অর্জনের জন্য ইসলামকে ত্যাগ করতে বা আপস করতে দ্বিধা করি না। কারণ আমাদের মাঝে নেই ইসলামের প্রকৃত ভালোবাসা। সুতরাং আজ বিশেষ প্রয়োজন ইমানকে শক্তিশালী করা। ইসলামের ইতিহাস তথা সাহাবায়ে কেরামগণ রা.-এর অসংখ্য ঘটনাই তাঁর সাক্ষী।

ইয়ারমুকের যুদ্ধের কথা ভাবুন! এই যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা খুবই কম ছিল। শত্রুদের সৈন্য অপেক্ষা তাদের সৈন্যসংখ্যা কয়েক হাজার মাত্র। এই যুদ্ধে এক খ্রিস্টান যে মুসলমানদের পক্ষে লড়াই করছিলেন; সে হজরত খালিদ রা.-এর সামনে বললেন, রোমান সৈন্যদের কোনো হিসাব আছে? হজরত খালিদ রা. দৃঢ়চিত্তে তাকে বললেন, সাবধান! যদি আমার ঘোড়ার লাগাম ঠিক থাকত তাহলে আমি রোমানদের খবর পাঠাতাম, যা সৈন্য আছে ততোধিক সৈন্য তোমরা নিয়ে এসো, আমরা প্রস্তুত।

হজরত খালিদ রা. কয়েক হাজার মাত্র সৈন্য নিয়ে লক্ষাধিক রোমান সৈন্যের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে এই রকম কথা বলার সাহস পেলেন কোথায়? কারণ তাঁর মাঝে ছিল ইসলামের হাকিকত আর রোমানদের ছিল সুরত বা ছবি। সুরত কখনো হাকিকতকে পরাজিত করতে পারে না। বরং চিরকালই হাকিকত সুরতকে পরাজিত করেছে। তাই আজকে যাঁরা বলে থাকেন এই দাজ্জালি শক্তিগুলোর গলার আওয়াজ অনেক উঁচু, তাঁদের কর্মকাণ্ড অনেক বিস্তৃত, তাঁরা আমাদের থেকে অনেক শক্তিশালী, আমি বলব তাঁরা পুনরায় ইসলামের ইতিহাস পড়ে দেখুন, না হলে আপনাদের শিক্ষা হবে না। দাজ্জালি শক্তিগুলো আজ যতই বড় হোক না কেন, আমরা জয়ী হবই হব। ইনশাআল্লাহ!

সাইয়েদ কুতুব শহীদ (রহ.)

বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুরুষ সাইয়েদ কুতুব শহীদ (রহ.)। সাইয়েদ কুতুব ১৯০৬ সালে মিসরের উসইউত জেলার মুশা গ্রামে কুতুব বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাজি ইব্রাহিম কুতুব, মায়ের নাম ফাতিমা হোসাইন ওসমান। মা যেমন ছিলেন অত্যন্ত খোদাভীরু ও দীনদার, তেমনি তাঁর বাবাও ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ও সচ্চরিত্রবান। মা-বাবার পাঁচ সন্তানের মধ্যে সাইয়েদ কুতুব ছিলেন সবার বড়। সব ভাইবোনই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে ইসলামী জীবন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরিক হয়ে কঠোর ইমানি পরীক্ষার মুখোমুখি হয়ে গোটা বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের প্রেরণার উৎস হয়ে রইলেন।

সাইয়েদ কুতুবের শিক্ষাজীবন শুরু হয় গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। শৈশবেই তিনি কুরআন শরিফ হেফজ করেন। প্রাথমিক বিদ্যালয় শেষে তিনি কায়রোর তাজহিয়াতু দারুল উলুম মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ১৯২৯ সালে ওই মাদ্রাসার শিক্ষা সমাপ্ত করে কায়রোর বিখ্যাত মাদ্রাসা দারুল উলুমে ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি ১৯৩৩ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে বিএ ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ওই মাদ্রাসায়ই অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

কিছুদিন অধ্যাপনা শেষে তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্কুল ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হন। আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির ওপর অধিক জ্ঞানার্জনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণ করে। সেখানে দুই বছরের কোর্স সমাপ্ত করে তিনি দেশে ফিরে আসেন। সেখানে থাকাকালে তিনি বস্তুবাদী সমাজের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করেন। বস্তুবাদী সমাজের অবস্থা দেখে তার এ প্রত্যয় জন্মে যে একমাত্র ইসলামী সমাজব্যবস্থাই মানবসমাজকে কল্যাণের পথে নিয়ে যেতে পারে।

আমেরিকা থেকে দেশে ফেরার পরই তিনি ইখওয়ানুল মুসলেমিন দলের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি গভীরভাবে যাচাই করতে শুরু করেন। তিনি ইখওয়ানের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে একমত হয়ে ১৯৫৩ সালে ওই দলের সদস্য হন এবং দলের তথ্য ও প্রচার বিভাগের সেক্রেটারি নির্বাচিত হন।

১৯৪৮ সালের ৮ ডিসেম্বর নাকরাশী পাশা ইখওয়ানকে অবৈধ ঘোষণা করেন। নিষিদ্ধ হওয়ার পর এ দলের হাজার হাজার কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৪৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যাবেলা ইখওয়ানুল মুসলেমিন দলের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়ের পাহাড় ইমানের পথে আহ্বানকারী উস্তাদ হাসানুল বান্নাকে

শুববানুল মুসলেমুনের কেন্দ্রীয় অফিসের সামনে প্রকাশ্যে শহীদ করা হয়। ১৯৫২ সালের জুলাই মাসে মিসরে এক সামরিক বিপ্লব ঘটে এবং ওই বছরই ইখওয়ান পুনরায় বহাল হয়ে যায় এবং ইখওয়ানুল হোদাইবি দলের মোর্শেদে আম নির্বাচিত হন। সাইয়েদ কুতুব দলের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনীত হন এবং দলের আদর্শ প্রচার ও আন্দোলনের সম্প্রসারণ তার পরিচালনাধীনে অগ্রসর হতে থাকে। ১৯৫৪ সালে সাইয়েদ কুতুবকে ইখওয়ান পরিচালিত সাময়িকী ইখওয়ানুল মুসলেমুনের সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। তাঁর সম্পাদনা দায়িত্ব গ্রহণের ছয় মাস পরই কর্নেল নাসের সরকার পত্রিকাটি বন্ধ করে দেয়। কারণ ওই বছর মিসর সরকার ব্রিটিশের সঙ্গে নতুন করে যে চুক্তি সম্পাদন করেন, ওই পত্রিকা তার কঠোর সমালোচনা করে। পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়ার পর নাসের সরকার ইখওয়ান কর্মীদের ওপর কঠোর নির্যাতন শুরু করে এবং এক বানোয়াট হত্যা-ষড়যন্ত্র মামলার অভিযোগ এনে দলটিকে বেআইনি ঘোষণা করা হয় এবং দলের নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার করা হয় সাইয়েদ কুতুবকেও। হাজার হাজার লোককে জেলে ঠেলে দেওয়া হয় এবং তাঁদের ওপর জুলুম-নির্যাতনের এমন চরম স্টিম রোলার চালানো হয়, যা দেখে মানব ইতিহাসের কালো অধ্যায়ও কেঁপে ওঠে। অবশেষে ছয়জন নেতার মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার মাধ্যমে এই নির্মম ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটে।

গ্রেপ্তারের সময় সাইয়েদ কুতুব ভীষণভাবে জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। সামরিক অফিসার তাঁকে ওই অবস্থায় গ্রেপ্তার করে এবং হাতে-পায়ে শিকল পরিয়ে দেয়। এ অবস্থায় তঁকে কোনো গাড়িতে না চড়িয়ে জেল পর্যন্ত হেঁটে যেতে বাধ্য করা হয়। অত্যধিক অসুস্থতার কারণে চলতে গিয়ে তিনি বারবার বেহুঁশ হয়ে পড়েন। জ্ঞান ফিরে এলে তিনি উচ্চারণ করতেন : আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ। জেলে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র জেল কর্মচারীরা তাঁকে নির্মমভাবে মারপিট করতে থাকে এবং দুই ঘণ্টা ধরে এ অত্যাচার চলতে থাকে। এতেই শেষ নয়, বর্বর জালেমরা তাঁর ওপর একটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর লেলিয়ে দেয়। কুকুরটি তাঁর পা কামড়ে ধরে জেলের আঙিনায় টেনে নিয়ে বেড়াতে থাকে। এরপর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় একটি নির্জন কক্ষে। সেখানে তাঁকে একটানা সাত ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। রক্তাক্ত বেদনায় জর্জরিত শরীর এসব শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন সহ্য করার মতো ছিল না। কিন্তু ইমানের বলে বলীয়ান পাহাড়ের মতো অবিচল মর্দে মুজাহিদ এসব অমানুষিক অত্যাচার অকাতরে সহ্য করেন। এ অবস্থায় তাঁর মুখে উচ্চারিত হতে থাকত আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

কয়েদখানার এক সঙ্গী সাইয়েদের ওপর নির্যাতনের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, হাসপাতালের কাছ দিয়ে তিনি ধীর কদমে এগোচ্ছিলেন। তাঁর প্রশস্ত কপাল থেকে অন্তরের স্বস্তি স্পষ্ট ঝিলিক মারছিল। চোখের চমক থেকে ঝরে পড়ছিল নূরের ধারা। তিনি এমনভাবে টেনে টেনে মাটির ওপর পা ফেলছিলেন, যেন তা শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। পায়ের অস্বাভাবিক ফোলা জল্লাদের নিষ্ঠুরতার জন্য যেন আর্তনাদ করছিল।

তাঁর ওপরে চালানো বিভীষিকাময় নির্যাতনের বর্ণনা দিয়ে ইউসুফ আল আজম লিখেছেন, 'সাইয়েদ কুতুবের ওপর বর্ণনাতীত নির্যাতন চালানো হয়। আগুন দ্বারা সারা শরীর ঝলসে দেওয়া হয়, পুলিশের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর লেলিয়ে দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থান রক্তাক্ত করা হয়। মাথার ওপর কখনো টগবগে গরম পানি ঢালা হতো। পরক্ষণে আবার খুবই শীতল পানি ঢেলে শরীর বরফের মতো ঠাণ্ডা করা হতো। পুলিশ লাথি, ঘুষি মেরে একদিক থেকে অন্য দিকে নিয়ে যেত।'

এভাবে নির্মম নির্যাতনের ফলে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে ১৯৫৫ সালের ২ মে তাঁকে সামরিক হাসপাতালে পাঠানো হয়। ওই বছরের ১৩ জুলাই মহকুমাতুস সাব অর্থাৎ জাতীয় আদালতে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। পরে এ দণ্ড বাতিল করে তাঁকে ১৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এক বছর কারাভোগের পর সরকারের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয় যে তিনি যদি সংবাদপত্রের মাধ্যমে ক্ষমার আবেদন করেন, তাহলে তাঁকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে। এ প্রস্তাবের জওয়াবে তিনি বলেন, 'আমি এ প্রস্তাব শুনে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হচ্ছি যে মজলুমকে জালিমের কাছে ক্ষমার আবেদন জানাতে বলা হচ্ছে। খোদার কসম। যদি ক্ষমা প্রার্থনার কয়েকটি শব্দ আমাকে ফাঁসি থেকেও রেহাই দিতে পারে, তবু আমি এরূপ শব্দ উচ্চারণ করতে রাজি নই। আমি আল্লাহর দরবারে এমন অবস্থায় হাজির হতে চাই যে আমি তাঁর প্রতি এবং তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট।

পরবর্তীকালে যতবারই তাঁকে ক্ষমা প্রার্থনার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, ততবারই তিনি এই বলে জওয়াব দিয়েছেন, 'যদি আমাকে যথার্থই অপরাধের জন্য কারারুদ্ধ করা হয়ে থাকে, তাহলে আমি এতে সন্তুষ্ট আছি। আর যদি বাতিল শক্তি আমাকে অন্যায়ভাবে বন্দি করে থাকে, তাহলে আমি কিছুতেই বাতিলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব না।'

এরপর সরকারের পক্ষ থেকে প্রলোভন দেখানো হলো যে যদি তিনি সম্মত হন, তাহলে তাঁকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হবে। সাইয়েদ এ প্রস্তাবের জওয়াবে বললেন, 'আমি দুঃখিত। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ আমার পক্ষে সে সময় পর্যন্ত

সম্ভব নয়, যতক্ষণ না পর্যন্ত মিসরের পুরো শিক্ষাব্যবস্থাকে ইসলামী ছাঁচে ঢেলে সাজানোর এখতিয়ার দেওয়া না হবে।'

জেলখানায় তাঁর ওপর চালানো হয় জাহেলি যুগের চেয়েও কঠিন নির্যাতন। এমনও হয়েছে যে একাধারে চার দিন তাকে একই চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয়েছে, কোনো খাবার-পানীয় দেওয়া হয়নি। তাঁর সামনেই অন্যরা উল্লাস করে পানি পান করত অথচ তাঁকে এক গ্লাস পানিও দেওয়া হতো না। হায়রে নিষ্ঠুরতা...!

সাইয়েদ কুতুব ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্তকারাগারে ছিলেন। ১৯৬৪ সালে ইরাকের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট আবদুস সালাম আরিফ কায়রো সফর করেন। ইরাকি আলেমদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ইরাকি প্রেসিডেন্ট জামাল নাসেরের সঙ্গে বৈঠককালে সাইয়েদ কুতুবকে মুক্তি প্রদানের অনুরোধ জানান। তাঁর অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সাইয়েদ কুতুবকে মুক্তি প্রদান করা হয়। কর্নেল নাসের তাঁকে মুক্তি দিয়ে অত্যন্ত কড়া নজরদারিতে তারই বাসভবনে অন্তরীণাবদ্ধ করেন। সাইয়েদ কুতুবকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়ার কারণে মিসরের কমিউনিস্ট গোষ্ঠী এবং তাদের মুরব্বিরা নাখোশ হয়। শুরু হয় কর্নেল নাসেরের ওপর নানা চাপ। কমিউনিস্ট পার্টি জামাল নাসেরের সহযোগিতার জন্য একটি শর্ত আরোপ করে। তা হচ্ছে মিসর থেকে ইখওয়ানকে নির্মূল করতে হবে। ১৯৬৫ সালে ইসরায়েলের মুরব্বি রাশিয়া থেকে নাসেরকে তলব করা হয়। পাশ্চাত্যের সেবাদাস নাসের ছুটে যায় প্রভুর ডাকে। ২৭ আগস্ট মস্কোয় আরব ছাত্রদের এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে জামাল নাসের ঘোষণা করেন যে মিসরের ইখওয়ানুল মুসলেমুন তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। অতীতে বহুবার সে ইখওয়ানকে ক্ষমা করেছে, এবার আর ক্ষমা করা হবে না। মস্কো থেকে নাসের দেশে ফিরে এলেই শুরু হয় ব্যাপক ধরপাকড়। গ্রেপ্তার করা হয় হাজার হাজার ইখওয়ান-কর্মীকে। পুনরায় গ্রেপ্তার করা হলো সাইয়েদ কুতুবকে। এবার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা দেখে নিজেই নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে আমি জানি জালেমরা এবার আমার মাথাই চায়। তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই। নিজের মৃত্যুর জন্য আমার কোনো আক্ষেপ নেই। আমার তো বরং সৌভাগ্য যে আল্লাহর রাস্তায় আমার জীবনের সমাপ্তি হতে যাচ্ছে। আগামীকালের ইতিহাস প্রমাণ করবে যে ইখওয়ানুল মুসলেমুন সঠিক পথের অনুসারী ছিল, নাকি এই জালেম শাসকগোষ্ঠীই সঠিক পথে ছিল। শুধু তাকেই নয়, তার ভাই মুহাম্মদ কুতুব, ভগ্নি হামিদা কুতুব ও আমিনা কুতুবসহ বিশ হাজারেরও বেশিসংখ্যক লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এদের মধ্যে প্রায় সাত শ ছিলেন মহিলা।

ইখওয়ানের প্রতি যেসব অভিযোগ আরোপ করা হয় তার প্রথমটি ছিল, ইখওয়ান একটি গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিল, যার নেতা ছিলেন সাইয়েদ কুতুব। সংগঠনটি অভিযুক্তদের জন্য আর্থিক সাহায্য ও অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ করত। এরা প্রেসিডেন্ট নাসেরের হত্যা পরিকল্পনা, বিশেষ ট্রেনগুলোর ধ্বংসের প্রশিক্ষণ দিত এবং এ প্রশিক্ষণ কাজে কতিপয় মহিলারও সহযোগিতা নিয়েছিল। সরকারি প্রেসনোটে বলা হয়েছে, শুধু এ কারণেই কি এ অভিযোগ সমর্থন করা যেতে পারে? সাধারণ বুদ্ধির একজন লোকও প্রশ্ন করবে যে ১৯৫৪ সালে হাজার হাজার কর্মীকে জেলে বন্দি করা হয়েছে। তাদের পরিবারবর্গ সীমাহীন দুর্দশা ও নিঃস্ব অবস্থায় জীবন কাটিয়েছে। স্বয়ং সাইয়েদ কুতুবকে দশ বছর পর মুক্তি দেওয়া হয় এবং এক বছর যেতে না যেতেই তাঁকে দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার করা হয়। মুক্তির পরও তাঁকে কড়া নজরে রাখা হয়। অথচ এটা কী করে বিবেক সায় দেবে যে তিনি এত কম সময়ের মধ্যে এত বড় ষড়যন্ত্র কিভাবে তৈরি করলেন এবং এ জন্য এত বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করলেন, যা সরকারের গদি ওলটপালট করে দেবে। প্রকৃতপক্ষে এসব ছিল ইখওয়ান নির্মূলের বানোয়াট বাহানামাত্র।

দ্বিতীয় অভিযোগ আনা হয় 'মায়ালেম ফিততরিক' পুস্তক লেখার জন্য। মিসরে সামরিক বাহিনীর একটি পত্রিকায় ১.১০.১৯৬৫ তারিখে প্রকাশিত ৪৪৬ নম্বর সংখ্যায় তাঁর বিরুদ্ধে অতীতের অভিযোগের যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, তার সারমর্ম নিম্নরূপ।

'লেখক পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সমাজ এবং মার্কসীয় মতবাদ উভয়েরই তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তিনি দাবি করেন যে ওই সব মতবাদের মধ্যে মানবজাতির জন্য কিছুই নেই। তার মতে বর্তমান দুনিয়া জাহেলিয়াতে ডুবে গেছে। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের জায়গায় অন্যায়ভাবে মানুষের সার্বভৌমত্ব কায়েম হয়ে গেছে। লেখক কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গিকে পুনরুজ্জীবিত করে ওই জাহেলিয়াতকে উচ্ছেদ করার ওপর জোর দেন এবং এ জন্য নিজেদের যথাসর্বস্ব কোরবানি করে দেওয়ার আহ্বান জানান।

তিনি আল্লাহ ব্যতীত সব শাসনকর্তাকে তাগুত আখ্যা দেন। লেখক বলেন, তাগুতের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য ইমানের শর্ত। তিনি ভাষা, গাত্রবর্ণ, বংশ, অঞ্চল ইত্যাদির ভিত্তিতে ঐক্যবোধকে ভ্রান্ত আখ্যা দিয়ে ইসলামী আকিদার ভিত্তিতে ঐক্য গড়া এবং ওই মতবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম করার জন্য মুসলিমদের উসকানি দিচ্ছেন।

লেখক তাঁর ওই পুস্তকের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ও সমগ্র মিসরে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ শুরু করা ও প্রতিটি সরকারকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা পেশ করেন।

ইখওয়ানের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো আনা হয়েছিল তা ছিল বাহানামাত্র। আসল ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইখওয়ান নেতা ও কর্মীরা ১৯৫৪ সালের শেষভাগ থেকে জেলখানায় বন্দি জীবনযাপন করেন। রাজনৈতিক তৎপরতার কোনো চিন্তা-কল্পনা করাও তাদের অসম্ভব ছিল। তবু তাদের জ্ঞানী ব্যক্তিরা জেলখানায় অথবা জেলের বাইরে জ্ঞানগত ও চিন্তাধারার দিক থেকে দেশের অভ্যন্তরে ইসলামকে রক্ষার যতটুকু খিদমত করা সম্ভব ছিল, তা তারা করেছেন। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে তারা সাহিত্য রচনা করেছেন। মিসরে তাফসির, হাদিস, ফিকহ, ইসলামী ইতিহাস ও ইসলামী জীবনব্যবস্থার ওপর বিপুল সাহিত্য বিগত দশ বছরে রচিত হয় এবং তা বিভিন্ন বিষয়ে এত বেশি ছিল যে লোকেরা লেখকদের সাহস, উদ্যম প্রদান ও প্রকাশকদের প্রশংসা না জানিয়ে পারেনি।

ইখওয়ান নেতা-কর্মীদের বিচার শুরু হলো বিশেষ সামরিক আদালতে। প্রথমত ঘোষণা করা হয় যে টেলিভিশনে ওই বিচারানুষ্ঠানের দৃশ্য প্রচার করা হবে। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তিরা 'অপরাধ স্বীকার' করতে অস্বীকার ও তাদের প্রতি দৈহিক নির্যাতনের বিবরণ প্রকাশ করায় টেলিভিশন বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর রুদ্ধ দ্বারকক্ষে বিচার চলতে থাকে। আসামিদের পক্ষে কোনো উকিল ছিল না। অন্য দেশ থেকে আইনজীবীরা আসামিপক্ষ সমর্থনের আবেদন করেন। কিন্তু তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। ফরাসি বার অ্যাসোসিয়েশনের ভূতপূর্ব সভাপতি উইলিয়ম থরপ ও মরক্কোর দুজন আইনজীবী আসামিপক্ষ সমর্থনের জন্য রীতিমতো আবেদন করেন। কিন্তু তা নামঞ্জুর করা হয়। সুদানের দু'জন আইনজীবী কায়রো পৌঁছে তথাকার বার অ্যাসোসিয়েশনে নাম রেজিস্ট্রি করে আদালতে হাজির হন। পুলিশ তাদের আদালত থেকে ধাক্কা মেরে বের করে দেয় এবং মিসর ত্যাগ করতে বাধ্য করে। সাইয়েদ কুতুব ও অন্যান্য আসামি ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে বিচার করাকালে ট্রাইব্যুনালের সামনে প্রকাশ করেন যে 'অপরাধ স্বীকার' করার জন্য তাদের প্রতি অমানসিক দৈহিক নির্যাতন চালানো হয়। ট্রাইব্যুনালের সভাপতি আসামিদের কোনো কথার প্রতিই কর্ণপাত করেন নাই। এমনিভাবে ১৯ মে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত আদালতে বিচার প্রহসন নাটক মঞ্চস্থ হয়।

ট্রাইব্যুনালের বিচারক জামাল নাসেরের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করে ১৯৬৬ সালের ২১ আগস্ট রায় ঘোষণা করেন। অভিযুক্ত ৪৩ জন নেতা-কর্মীর মধ্যে

সাতজনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এরা হচ্ছেন সাইয়েদ কুতুব, মুহাম্মদ ইউসুফ, আবদুল ফাত্তাহ ইসমাইল, শবরি আরাফাহ, আহমদ আবদুল মজিদ, আবদুল আজিজ ও আলী উসমাভি।

সাইয়েদ কুতুবের মৃত্যুদণ্ডাদেশ শোনার পর আদালত-সংশ্লিষ্ট লোকজন কান্নায় ভেঙে পড়েন। অথচ সাইয়েদ রায় শোনার পর খুশি মনে বলে উঠলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ'। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'আমার কাছে এটা কোনো বিষয় নয় যে আমি কোথায় মরতে যাচ্ছি এবং কিভাবে জালিমরা আমার মৃত্যুদণ্ড দেবে। আমি তো এতেই সন্তুষ্ট যে আমি আল্লাহর একজন অনুগত বান্দা হিসেবে শাহাদতের পেয়ালা পান করতে যাচ্ছি।'

এর পরের দৃশ্য বড়ই করুণ। জয়নাব আল গাজালি লিখেছেন, মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়ার পাঁচ দিন পর সাইয়েদ কুতুব কারাগারে আটক ছোট বোন হামিদা কুতুবকে দেখতে তাঁর কক্ষে যান। ছোট বোন তাঁকে দেখে বলেন, 'ধন্যবাদ, প্রিয় ভাই সাইয়েদ। এটা আমার জন্য এক দুর্লভ মুহূর্ত। আপনি আমার পাশে একটু বসুন।'

সাইয়েদ পাশে বসলেন। বিভিন্ন বিষয়ে অনেক আলোচনা হলো। তিনি সবাইকে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিলেন। হামিদা কুতুব মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ভাইকে দেখে বিষণ্ন হয়ে পড়েন। কিন্তু সাইয়েদ কুতুবের সঙ্গে কিছু কথা বলার পর হামিদা কুতুবের বিষণ্ন বদনেও হাসির রেখা ফুটে উঠল।

২৮ আগস্ট রাতে সাইয়েদ কুতুব ও তাঁর দুই সঙ্গীকে ফাঁসির সেলে নিয়ে যাওয়া হলো। ২৯ আগস্ট ভোর রাত। ইতিমধ্যে ফাঁসির সব আয়োজন শেষ। সাইয়েদ অত্যন্ত আনন্দিত। নির্ভীকচিত্তে সামনে পা বাড়াচ্ছেন। তাঁর মুখে তৃপ্তির হাসি। সোবহে সাদিকের আলো ঝলমল ধরণী যেন আজ গভীর বেদনাপ্লুত। সাইয়েদ কুতুব হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে উঠলেন। চারদিকে ভেসে উঠল ফজরের আজান। এমনি এক পবিত্র পরিবেশে কার্যকর করা হলো ইতিহাসের ঘৃণ্যতম আয়োজন, সাইয়েদ কুতুব ও তাঁর সঙ্গীদের ফাঁসি। সারা বিশ্বের অগণিত মানুষকে কাঁদিয়ে সাইয়েদ কুতুব পৌঁছে গেলেন তাঁর পরম প্রিয় প্রভুর সান্নিধ্যে। পেছনে রেখে গেলেন এক বিরাট সাহিত্যসম্ভার। তাঁর বিশেষ বিশেষ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েকটি শিশু সাহিত্যসহ তেফলে মিনাল কারিয়া, মদিনাতুল মাশহুর, মাশাহেদুল কেয়ামাহ ফিল কোরআন, মারেফাতুল ইসলাম ওয়ার রেসমালিয়াহসহ প্রায় বিশখানা গ্রন্থ। তাফসির ফি জিলালিল কোরআন সাইয়েদ কুতুবের এক অনবদ্য অবদান। আট খণ্ডে সমাপ্ত এক জ্ঞানের সাগর। তাঁর এ গ্রন্থাবলি ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ও নেতাদের জন্য পথনির্দেশিকা ও

অনুপ্রেরণার অনন্ত উৎস হয়ে থাকবে। *[এই লেখাটি সরাসরি ইন্টারনেট Black Flags From The East, Black Banners Come Out of Khurasan Nathing Will Stop Them. Until They Are Raised In Jerusalem এ অংশ থেকে নেওয়া]*

মোল্লা ইয়ার মুহাম্মদ আখুন্দ

[১৯৫৯ সাল থেকে ১৪১৯ হিজরি]

মোল্লা ইয়ার মুহাম্মদ আখুন্দ হাজি খান মুহাম্মদের ছেলে ও হাজি নিয়াজ মুহাম্মদের পুতি ছিলেন। তিনি ১৯৫৯ সালের ১২ আগস্ট কান্দাহার প্রদেশে দামান জেলার মারগান কিচি এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তার মাতৃভাষা ছিল পশতু। তিনি পুপলজাই গোত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন।

তিনি কৈশোরেই দীনি ইলম অর্জনের প্রতি গুরুত্ব দেন। কান্দাহার প্রদেশের নিশ জেলার বিভিন্ন এলাকায় তিনি ইলম হাসিল করতে থাকেন। ২০ বছর বয়সে তিনি জিহাদ শুরু করেন। তারপর জিহাদি কার্যক্রমের সঙ্গে সঙ্গে দীনি ইলম অর্জনের প্রতিও খেয়াল রাখেন। তার জিহাদি কার্যক্রমের অধিকাংশই কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে এবং কান্দাহার ও জাবেল প্রদেশের আশপাশের এলাকায় ছিল। এ ছাড়া কান্দাহার ও কলাতের মাঝখানের রাস্তাগুলোতে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাফেলার ওপর ঝড় বয়ে দেওয়ার প্রতিও তার মনোযোগ ছিল। তার উল্লেখযোগ্য জিহাদি বিশেষত্বের মধ্যে একটি হলো তার আরপিজির নিশানা খুবই অব্যর্থ ছিল। তিনি আরপিজি-৭ রকেটের দক্ষতম নিশানাবাজ ছিলেন। তিনি স্টিঙ্গার মিজাইল প্রশিক্ষণে দক্ষতার পর দুশমনের বিমানও ভূপাতিত করতে থাকেন।

দুশমনের হাতে প্রথম গ্রেপ্তারি ও মুক্তি

মোল্লা ইয়ার মুহাম্মদ আখুন্দ ড. নজীবের হুকুমতের সময় সফা ও দামান শহরের মাঝামাঝি এলাকা পুইগাওয়ে কমিউনিস্টদের হাতে গ্রেপ্তার হন। তিনি বন্দিজীবনে খুবই কঠিন কষ্ট সহ্য করেন। তারপর এক স্থানীয় গোত্রপ্রধান হাবীব আকা এর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় মুক্তি পান। মুক্ত হয়েই তিনি আবারও জিহাদের ময়দানে ফিরে আসেন।

কমিউনিস্টদের পালিয়ে যাওয়ার পর সেসব লোকের যুগ আসে, যারা নিজেদের মুজাহিদ বলতে পরোয়া করত না। কিন্তু তারা ফেতনা-ফাসাদ ও গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যায়। মোল্লা ইয়ার মুহাম্মদ তখন কান্দাহার বিমানবন্দরের পার্শ্ববর্তী এলাকা ইয়াসরিতে নিজের মুজাহিদ সঙ্গীদের সঙ্গে অবস্থান করছিলেন। আন্দোলন যখন ডাণ্ড জেলা পর্যন্ত পৌঁছে, তখন তিনি তাঁর আগের জানাশোনার ওপর ভিত্তি করে আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ, মোল্লা মুহাম্মদ ওমর মুজাহিদ দা.বা. এবং মোল্লা আবদুল গনি বেরাদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেই মজলিশে মোল্লা মুহাম্মদ রব্বানি এবং মোল্লা মুহাম্মদ আবদুল মান্নানও উপস্থিত ছিলেন। মোল্লা ইয়ার মুহাম্মদ তাহরীকে তালেবানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বোঝার পর মোল্লা মুহাম্মদ ওমর মুজাহিদ দা.বা.-এর হাতে বায়াত হওয়ার ফায়সালা করে ফেলেন।

দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার ও মুক্তি

মোল্লা ইয়ার মুহাম্মদ গজনী, ভিরদাক, লোগারের জেলাগুলোতে যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন। কাবুলে হামলার সময় তিনি আহমদ শাহ মাসউদের সৈন্যদের হাতে গ্রেপ্তার হন। দ্বিতীয়বার মুক্তির পর তাঁর ইচ্ছা ও স্পৃহায় কোনো পরিবর্তন আসেনি। তিনি আবারও তালেবানের সঙ্গে দায়িত্ব পালনে মশগুল হয়ে যান। হেরাত বিজয়ের পর তাঁকে সেখানকার গভর্নর নিয়োগ দেওয়া হয়।

তিনি হেরাতের গভর্নর হিসেবে বহু ঐতিহাসিক কাজ করেন। হেরাতের উন্নয়ন ও বিনির্মাণে তিনি এক নতুন অধ্যায় রচনা করেন। তিনি তাঁর যুগে হেরাতের ঐতিহাসিক জামে মসজিদে বহু কাজ করেন। তা ছাড়া বহু ঐতিহাসিক ও সরকারি স্থাপনা, মসজিদ, মাদ্রাসা ও জনকল্যাণমূলক স্থাপনা নির্মাণ করেন। প্রাদেশিক রাজধানীর এক শানদার মসজিদও তার দায়িত্বশীলতা ও আন্তরিকতার সাক্ষি। তিনি মাদ্রাসার সঙ্গে সীমাহীন মহব্বত পোষণ করতেন এবং তাদের সহযোগিতার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন।

বসন্ত যখন নওবসন্ত হয়

উত্তরাঞ্চলে অগ্রযাত্রার জন্য তালেবান রাস্তায় জমে থাকা বরফ গলে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিল। অপেক্ষার পালা একপর্যায়ে শেষ হয়। পাহাড়, উপত্যাকা ও ময়দান সবুজ চাদর ওড়াতে শুরু করে। এ সবকিছু বসন্তের আগমনী বার্তা। সবকিছুই বরফের চাদরে ঢাকা ছিল। এখন চারদিকেই সজীবতা ও রং-বেরঙের বাহারি ফুল ফুটতে শুরু করেছে। বরফ গলে যাওয়ার পর নদী-নালায় কলকল

ধ্বনিতে প্রবহমান পানি তার আপন পুরনো রাস্তাকে সিঞ্চিত করে দ্রুত ধাবমান ছিল। যেগুলোতে কিছুদিন আগেও বরফ ছাড়া কিছুই দেখা যেত না। এখন দৃশ্যপট পরিবর্তন হয়ে গেছে। বিভিন্ন রকমের চারা, শিকড় ও কুঁড়ি মাথা ওঠাচ্ছে। কিছুদিন পরই এগুলো পূর্ণ যৌবনে ফিরবে। ময়দান ও পাহাড়গুলো রং-বেরঙের কলি ও ফুলে সাজবে। বিগত দিনগুলোতে তালেবান মুজাহিদীন কেবল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়েই ব্যস্ত এবং ছটফট করছিল। এবার তাদের অপেক্ষার পালা শেষ। এই মৌসুমের অপেক্ষায় তাদের মজবুত বাহুগুলোর ম্যাসল অস্থির ছিল। বসন্তকালেই তালেবান সর্বদা সফলতার মুখ দেখেছে।

শাহাদাতবরণ

একদিন রেডিও 'সদায়ে শরিয়ত'-এর বুলেটিনে মোল্লা ইয়ার মুহাম্মদ আখুন্দের শাহাদাতের খবর শুনি। সংবাদ অনুযায়ী তিনি তখন গজনীর গভর্নর ছিলেন। গজনী শহরের উত্তর জেলায় হিজবে ওয়াহদাতের লোকেরা হামলা করে বসে। মোল্লা ইয়ার মুহাম্মদ আখুন্দ নিজে সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সেই যুদ্ধেরই লড়াইয়ে মেশিনগানের এক গুলি তার গায়ে লাগে এবং তিনি ১৮ জুমাদাল উলা, ১৪১৯ হিজরিতে শাহাদাতবরণ করেন।

প্রচারমাধ্যম

বর্তমান যুগের দাজ্জালী মিডিয়া জনগণকে সে সব কিছুই দেখায়, শোনায় ও পড়ায়, যা কিছু মিডিয়ার মালিকরা দেখাতে, শোনাতে ও পড়াতে চায়। বর্তমান মিডিয়া চাই তা ইলেকট্রিক মিডিয়া হোক কিংবা প্রিন্ট মিডিয়া হোক, জনগণকে প্রকৃতপক্ষে ইহুদি চিন্তা-চেতনায় প্রস্তুত এমন এক কোট পরিহিত তামাশা দেখাচ্ছে, যেখানে কোটের সব সুতা দাজ্জালী খাদেমরা নড়াচড়া করে। যে জিনিসের মাধ্যমে দাজ্জাল খুশি হয়ে যায়, সুতা নাড়নেওয়ালা নিজ হাতে সেসব কোটের মাধ্যমে জনগণকে সেই তামাশাই দেখায়। যার মধ্যে নোংরামি, উলঙ্গপনা, দীনহীনতা, বস্তুবাদ, মাতা-পিতা মুক্ত সমাজব্যবস্থা ও চারিত্রিক অধঃপতনের তামাশাই অধিকাংশ স্থান পায়।

ইসলামী শরিয়তে মিথ্যার বিলকুল সুযোগ নেই। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সত্য সংবাদ ইসলামের বিশেষত্ব। সাংবাদিকতার পরিভাষাটি 'সহিফা' শব্দ থেকে বের করা হয়েছে, ইসলামে এমনটিই মানা হয়। আর সহিফার অর্থ হলো মাসহাফ।

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার বিধি-বিধানের সংবাদদানকারী কিতাবসমূহ। সব সহিফা সন্দেহ ও মিথ্যার অবকাশ থেকে পাক-পবিত্র হয়।

তালেবান সিরাতে মুস্তাকিমের যাত্রী। তারা দীনে ইসলাম ও ইসলামী শরিয়তের অন্বেষণকারী। তারা সাংবাদিকতার মর্যাদা ও অবস্থান বুঝে শরিয়ত প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। আফগানিস্তানে দাজ্জালী চোখ অর্থাৎ টিভি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর দাজ্জালী মিডিয়ার যন্ত্রপাতি হওয়া লোকদের আফসোসের ওপর পানি ঢেলে দেয়। তালেবান প্রচারমাধ্যম হিসেবে 'রেডিও সদায়ে শরিয়ত' নামে নিজেদের প্রচার শুরু করে, যার প্রতিটি কথা প্রতিষ্ঠিত সত্য এবং দিবালোকের মতো স্পষ্ট। সদায়ে শরিয়তের প্রচারের মধ্যে সত্য সংবাদ ও ইসলামী প্রোগ্রামের মধ্যে কুরআনের তাফসির, সিরাতে রাসুল সা., সিরাতে সাহাবায়ে কেরাম রা., দীনি সংশোধনীমূলক বয়ান ও জিহাদি তাড়না ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এসব ছাড়াও প্রিন্ট মিডিয়ার মধ্যে 'আখবারাত', সাময়িকীর মধ্যে 'শরিয়ত', 'রোজনামায়ে হাওয়াজ', 'আনিস' ও 'কাবুল নামাহ' ইত্যাদি সংবাদপত্র চালু করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সত্যনিষ্ঠ সংবাদপত্রের অনুমোদন দিয়ে জনগণকে দাজ্জালী চক্রান্ত ও ধোঁকার থাবা থেকে মানসিকভাবেও স্বাধীন করা হয়। এসব সাংবাদিকতার ফলে জনগণের মন-মানসিকতা সংকীর্ণতায় আতঙ্কিত হওয়ার পরিবর্তে আল্লাহর ওপর ভরসা ও ইমানের সঙ্গে মৃত্যুর দিকে মনোযোগী হয়ে যায়। আর এই পবিত্র সাংবাদিকতার মাধ্যমে জনগণের ইমান হেফাজতের কাজও করা হয়।

প্রতিটি মুহূর্তে জনগণের সেবায় ইমারাতে ইসলামিয়ার জোয়ানরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে অন্যান্য সেবার সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বহাল করতেও উঠে-পড়ে লাগে। জনগণের পরস্পরে ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বহাল করার জন্য পূর্ণ প্রচেষ্টা শুরু করে। তালেবান কর্তৃপক্ষ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বহাল ও সুসজ্জিত করতে ১৯৯৭ সালে সুইডেনের এক যোগাযোগ কোম্পানি 'পেন এশিয়ান'-এর সঙ্গে চুক্তি করে। পেন এশিয়ান কোম্পানি ৬ মিলিয়ন ডলারের বড় অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে বহির্বিশ্বের সঙ্গে আফগানিস্তানের যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করে দেয়।

অভ্যন্তরীণ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাও এই কোম্পানি বহাল ও সুসজ্জিত করে দেয়। ১৯৯৮ সালের মার্চে কাবুলে ২১ হাজার, হেরাতে এক হাজার ৭০০,

জালালাবাদে এক হাজার ৪০০ ও কান্দাহারে এক হাজার ডিজিটাল টেলিফোন লাইন চালু করে দেয়।

যেসব জায়গায় ল্যান্ড লাইনের ব্যবস্থা ছিল না তালেবান কর্তৃপক্ষ সেসব জায়গায় স্যাটেলাইট পাবলিক কল সেন্টার স্থাপন করে। এ ছাড়া জনগণের সেবার উদ্দেশ্যে তালেবান মুজাহিদীন জনগণের যোগাযোগের জন্য নিজেদের ওয়ারলেস সেটও হাজির করে। মুজাহিদীন নিজ নিজ সেনা ছাউনি থেকে এই সেবা প্রদান করতে থাকে। সেনা ছাউনির পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসরত লোকদের যদি আত্মীয়-স্বজন কিংবা কারো সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজন পড়ত, তাহলে মুজাহিদীন নিজেদের ওয়ারলেসের মাধ্যমে সংবাদ পাঠিয়ে তাকে ডেকে দিত এবং ওয়ারলেসে কথা বলিয়ে দিত। এতে কোনো ফি কিংবা বিনিময় নেওয়া হতো না। মুজাহিদীনের বিনা মূল্যে সেবা প্রদান আফগান জনগণের দিলে তাদের মহব্বত ও মর্যাদা আরো বাড়িয়ে দেয়।

এই সেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেবা অর্থাৎ ওয়ারলেস 'পিসিও' বড় বড় ব্যবসায়ীরাও ব্যবসা হিসেবে স্থাপন করে রেখেছিল। তালেবান কর্তৃপক্ষ তাদেরও উৎসাহিত করে। এই নেটওয়ার্কে ব্যবসায়ীরা মোটরসাইকেল ও গাড়ির মাধ্যমে দূর-দূরান্তের এলাকায় গিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সংবাদ পৌঁছে দিত। আর এভাবে উভয়পক্ষের মধ্যে আপসে কথাবার্তা বলিয়ে সীমিত বিনিময় নিয়ে নিজেরা হালাল উপার্জন করত। যোগাযোগ ব্যবস্থাপনায় নিজেদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তালেবান প্রচুর কাজ করে ও জনসেবার উপমা স্থাপন করে।

এটাই বাস্তবতা। যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য আল্লাহর পথে আসে, আল্লাহর কসম, আল্লাহর রহমত তাকে স্বাগতম জানায়।

দুনিয়ার দৌলতকে পদাঘাতকারী মূর্তিহন্তা তালেবান

পৃথিবীর ইতিহাসে তাওহিদের সন্তানরা এক এবং একক প্রকৃত মাবুদের একত্বকে বিজয়ী করার জন্য প্রত্যেক যুগে দুনিয়ার মিথ্যা মাবুদ এবং মূর্তিগুলোকে টুকরা টুকরা করে সেগুলোর বাস্তবতা প্রকাশ করে দিয়েছে যে এসব তো মিথ্যা মাবুদ। যখন এগুলো নিজেকেই রক্ষা করতে পারে না, তখন অন্যের কী উপকার করবে?

হজরত ইব্রাহিম আ. মূর্তি ভেঙে পৃথিবীর সর্বপ্রথম মূর্তিহন্তা হিসেবে খ্যাত হন। এক আল্লাহ তাআলার কালেমা বুলন্দ করতে গিয়ে তিনি কোনো ভৎর্সনাকারীর

ভৎর্সনাকে পরোয়া করেননি। যার ফলে আল্লাহ তাআলা হজরত ইব্রাহিম আ.কে নিজের খলিল বানিয়ে নেন। তারপর হজরত মুসা আ. সামেরি জাদুকরের বানানো বাছুরকে জ্বালিয়ে সেই ছাই-বাতাস ও সমুদ্রে ভাসিয়ে সে কথাই প্রমাণ করেছেন যে সত্যিকারের মাবুদ কেবল এবং কেবলই এক আল্লাহ। তাঁকে ছাড়া আর কোনোই মাবুদ নেই। তোমরা তোমাদের মাবুদ বাছুরের অবস্থা দেখো, কিভাবে বিক্ষিপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। হজরত মুসা আ.কে আল্লাহ তাআলা তার কালিম বানিয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত হজরত ইব্রাহিম আ. ও মুসা আ.-এর সুনাম জারি করে দিয়েছেন।

নবীগণের সুন্নত জিন্দা করতে গিয়ে তাওহিদ ও একত্ববাদের মশালধারী গজনীর সুলতান, মাহমুদ গজনভী হিন্দুস্তানের বড় মন্দির, সোমনাথের মূর্তিগুলোকে টুকরা টুকরা করেছেন। সোনা, রুপা ও মণি-মুক্তাকে পদদলিত করে, মূর্তিপূজারি, শিরক ও কুফরি ইবাদাতকে অস্বীকার করে প্রমাণ করেছেন যে সব ইবাদাতের মালিক কেবল এবং কেবলই এক আল্লাহ তাআলা। তাকে ছাড়া কেউই ইবাদাতের যোগ্য নয়।

বর্তমানের বস্তুবাদীর সংকটময় যুগে নবী ও সলফে সালেহীনের পথ অনুসরণ করে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সম্মানিত আমিরুল মুমিনীন ২০০১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করতে ফরমান জারি করলেন, বামিয়ান ও দেশের অন্য সব মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলো।

শরিয়তে ইসলামীর হক ও সত্য সৈন্যদলের মুজাহিদীন এই ঘোষণার ওপর আমল করতে কাজ শুরু করেন। গোটা বিশ্বের কাফেররা চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে। তারা তাদের মাবুদদের প্রাণহীন পাথরগুলোকে সমপরিমাণ মাল-দৌলতের বিনিময়ে ক্রয় করার প্রস্তাব পেশ করতে থাকে। বৌদ্ধ ধর্মের লোকেরা তাদের প্রাণহীন মাবুদগুলোর সাহায্য করতে তালেবান মুজাহিদীনকে বড় অঙ্কের অর্থ ও আফগানিস্তানের পুনর্নির্মাণে মন খুলে খরচ করার প্রস্তাব পেশ করে। তাদের মূর্তিগুলোকে না ভাঙার বিনিময়ে দুনিয়াবি সব চাহিদা পূরণে রাজি হয়ে যায়।

কিন্তু আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর মুজাহিদ দা.বা. সব প্রস্তাবকে সত্যিকারের মাবুদের একত্ব রক্ষার জন্য নিজের জুতার নিচে রেখে পদদলিত করে ঐতিহাসিক বাক্য উচ্চারণ করেন,

'আমি নিজেকে মূর্তিহন্তা হিসেবে পরিচয় দিতে পছন্দ করি, মূর্তিবিক্রেতা হিসেবে নয়।'

কারণ, মূর্তিহন্তা ছিলেন ইব্রাহিম আ., আর মূর্তিবিক্রেতা ছিল আজর। মূর্তিহন্তা ছিলেন সুলতান মাহমুদ গজনভী আর মূর্তিপূজারি ছিল হিন্দু বেনিয়ারা। এখানেও মূর্তিহন্তা ও তাওহিদের পূজারি ছিলেন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর মুজাহিদ দা.বা. আর মূর্তিকে প্রয়োজন পূরণকারী ও খোদা মাননেওয়ালা ছিল বৌদ্ধরা।

সুতরাং আমিরুল মুমিনীনের আদেশের পর পূর্ণ প্রস্তুতির সাথে ২০০১ সালের ১২ মার্চ প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোল্লা উবায়দুল্লাহ আখুন্দ, মোল্লা শাহজাদা আখুন্দ ও মোল্লা আব্দুল মান্নান হানাফীর নেতৃত্বে মাইন বিশেষজ্ঞ উস্তাদ কমান্ডার লাআল মুহাম্মদ ১২৫০ মণ বারুদের ২০০ অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মাইন ও জেট বিমানের ৪২টি বোম লাগিয়ে বামিয়ানের ১৭০০ বছরের পুরাতন মূর্তি বাতাসে উড়িয়ে দেয়। সেটি ভেঙে দেওয়ায় না আসমান কেঁদেছে, না জমিনে কেউ তুফান বয়ে দিয়েছে। কিন্তু পৃথিবী সেই পুরাতন মূর্তি থেকে পবিত্র হয়ে গেছে। সত্যের পতাকাবাহীরা বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছে, মহান ও মহৎ খোদা কেবল এবং কেবলই এক, লা শারিক আল্লাহ।

মূর্তিগুলো ভেঙে দেওয়ার পর ১০০টি গরু কুরবানি করে কাফ্ফারা আদায় করা হয় এবং সেগুলোর গোশত গরিব-মিশকিনদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। এই কাফ্ফারার কারণ ছিল, ইসলামী হুকুমত কায়েম হওয়ার পর মূর্তিগুলো ভাঙতে যে বিলম্ব হয়েছে আল্লাহ তাআলা যেন তা ক্ষমা করে দেন। আমীন।

আমিরুল মুমিনীন, মূর্তিগুলো টুকরা টুকরা করে পূর্ণ দূরদর্শিতার সঙ্গে ইন্টারন্যাশনাল সাংবাদিকদের বামিয়ান পরিদর্শনের অনুমতি দিয়ে তাদের এই সবক দেন যে তোমাদের খোদা তো নিজের হেফাজত করতেই ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের কী ছাই মদদ করব?

আফগান জিহাদের উজ্জ্বল সেতারা
মোল্লা সাইফুর রহমান

মোল্লা সাইফুর রহমান মানসুর আফগান জিহাদের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুজাহিদীনের পথের মশাল হয়ে থাকবে। এই চমকানো উজ্জ্বল নক্ষত্রের জীবনযাপনের অবস্থা সেই কথারই প্রতিবিম্ব যে তিনি একজন স্বভাবগত এবং জন্মগত মুজাহিদ ছিলেন।

মোল্লা সাইফুর রহমান মানসুর শহীদ হওয়ার প্রায় ৪২ বছর আগে পাকতিয়া প্রদেশের যারমাত জেলার অন্তর্ভুক্ত সাহাকো এলাকার হায়বাতখিল গ্রামের শহীদ মৌলবি নাসরুল্লাহ মানসুরের ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন। তাঁর খান্দান ইলমি ও

দীনি খান্দান ছিল। তাঁর পিতা ফজলুর রহমান মানসুর মৌলবি নাসরুল্লাহ মানসুর নামেই প্রসিদ্ধ হন। তাঁর পিতা তাঁর এলাকা ও জাতীয় পর্যায়ের দীনি এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর পিতা গজনীর নূরুল মাদারিস ফারুকিয়া থেকে লেখাপড়া শেষ করেছিলেন। তিনি ছিলেন উলামায়ে কেরামের 'খুদ্দামুল ফুরকান' নামক সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ জিম্মাদারগণের একজন। মৌলবি নাসরুল্লাহ মানসুর আফগানিস্তানের রাজনৈতিক ও দাওয়াতি কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রাসায় দরসদানের কাজও করতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর গ্রাম হায়বতখিলে দরসদানের কামরা খুলে রেখেছিলেন।

সাইফুর রহমান মানসুর মৌলবি নাসরুল্লাহ মানসুরের দ্বিতীয় ছেলে। তিনি তাঁর আলেম ও মুজাহিদ পিতার ছায়ায় লালিত-পালিত হন। যার ফলে তিনি ছোটবেলা থেকেই এক ইলমি ও জিহাদি পরিবেশে তারবিয়ত লাভ করেন। তিনি তাঁর লেখাপড়া শুরু করেন নিজ এলাকা হায়বাতখিলে নিজের বাবার মাদ্রাসা থেকে। দাভের খানের যুগে যখন রাজনৈতিক উলামায়ে কেরামের জন্য পরিস্থিতি খুবই কঠিন আকার ধারণ করে, তখন মৌলবি নাসরুল্লাহ মানসুর শহীদ তাঁর পরিবারপরিজন নিয়ে নিজের এলাকা ছেড়ে গজনীর দিকে চলে যান এবং সেখানে বাড়ি করেন। সেখানে থেকেই তিনি ইমামত, দরস, আত্মশুদ্ধি ও রাজনৈতিক কার্যক্রম শুরু করেন। মোল্লা সাইফুর রহমান মানসুর এখানেও নিজের লেখাপড়া চালু রাখেন। কিন্তু যখন এখানের পরিস্থিতিও খারাপ হয়ে যায়, তখন তাঁর পিতা মৌলবি নাসরুল্লাহ মানসুর শহীদ তাঁর পরিবারপরিজনকে আবারও পিতৃভূমি হায়বাতখিলে পাঠিয়ে দেন এবং তিনি নিজে বর্ডার পার হয়ে মিরানশাহে উত্তর ওজিরিস্তানে চলে আসেন।

কিছুদিন পর যখন আফগানিস্তানে কমিউনিস্টদের জবরদখল প্রতিষ্ঠা হয়ে যায় এবং লোকজন হিজরত শুরু করে, তখন সাইফুর রহমান মানসুরও তাঁর পরিবারপরিজনের সঙ্গে হিজরত করে প্রথমে উত্তর ওজিরিস্তানে এবং পরে পেশোয়ারে চলে আসেন। মোল্লা সাইফুর রহমান মানসুর কিছুদিন খায়বার পখতুনখাহের ডেঁরা ইসমাইল জেলার ক্লাচি এবং তারপর গুজরানওয়ালা এলাকায় জামিয়া আরাবিয়াতে লেখাপড়া করেন। তারপর দীর্ঘদিন পেশোয়ারে মাদ্রাসায়ে জামিয়া নূরুল মাদারিস ফারুকিয়ায় লেখাপড়া করেন। এখানে তিনি জামাতে নহম পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। তারপর জিহাদি কার্যক্রমে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় লেখাপড়া চালু রাখতে পারেননি। সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও তিনি ইসলামী দাওয়াত ও রাজনৈতিক বিষয়বস্তুর ওপর বিশেষ কিছু কোর্সও করেন। মৌলবি নাসরুল্লাহ মানসুর শহীদ বার্ষিক ছুটির দিনগুলোতে ছাত্রদের জন্য সেসব

কোর্সের ব্যবস্থা করতেন। মোল্লা সাইফুর রহমান মানসুর যুদ্ধের প্রশিক্ষণেও পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করেন। সেই সফঙ্গ ভারী অস্ত্রশস্ত্র চালনায়ও দক্ষতা অর্জন করে রাখেন।

মোল্লা সাইফুর রহমান মানসুর নফসে আম্মারাহ ও শয়তানকে প্রতিরোধ করার ব্যবস্থাও করে রেখেছিলেন। তিনি তাঁর পিতার মতোই নকশবন্দিয়া মুজাদ্দেদিয়া তরিকার প্রসিদ্ধ সুফি ও সালেক ছিলেন। মোল্লা সাইফুর রহমান মানসুর প্রথমে উর্গন্দি খলিফা সাহেবের হাতে বায়আত হন। তারপর জারমাতে খলিফা দীন মুহাম্মদ সাহেব ও ভিরদাকে খলিফা আহমদ জিয়া সাহেবের সঙ্গেও পৃথক সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি তাসাউফের পথে একজন মুত্তাকি মুসাফির ছিলেন। জিহাদি ব্যস্ততার সময় নিজের সঙ্গীদের জন্য অসাধারণ আমল নির্ধারণ করতেন। তিনি তাঁর জিন্দেগির শেষ সময় পর্যন্ত তাসাউফের বেশকিছু স্তর পার করে ফেলেছিলেন। তাঁর মুজাহিদ সঙ্গী জিহাদের সময়কার বিভিন্ন কেরামতের ঘটনা বর্ণনা করতেন। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় কেরামত তাঁর শাহাদাতের সময় হয়েছিল। তাঁর লাশ থেকে এমন এক খুশবু বের হতে থাকে, যার পেছনে চলতে চলতে তাঁর ভাই তাঁর লাশের সন্ধান পেয়েছিলেন।

তাঁর এক বন্ধু তাঁর ব্যাপারে বলেন, 'সাইফুর রহমান সাহেব ২১ বছর বয়সে যখন ক্লাচিতে পড়ালেখা করছিল, তখন যখনই কোনো দোয়া হতো খুব কান্না করত। একদিন আমি মোল্লা সাইফুর রহমান মানসুরকে জিজ্ঞেসই করে ফেলি যে তুমি কেন এত বেশি কান্না করো? তখন সে বলে, আমরা তো মাদ্রাসায় আরামে বসে আছি। অথচ আজকের এই দিনে না জানি কত মুজাহিদীন আফগানিস্তানের পাহাড়ে শহীদ হয়ে গেছেন। তাই সব সময় আল্লাহ তাআলার কাছে নিজের শাহাদাতের দোয়া করি।'

এই মজ্জাগত জিহাদি স্বভাবের কারণে মোল্লা সাইফুর রহমান মানসুর সাহেব নিজের সব যোগ্যতা ও পূর্ণ যৌবন জিহাদেই ব্যয় করেন। ১৬ বছর বয়সে প্রথমবার তিনি রুশ এবং তাদের গোলাম কমিউনিস্ট সৈন্যের বিরুদ্ধে জিহাদে শরিক হন। তখন তিনি যখমিও হন। তিনি খোস্ত প্রদেশেও জিহাদে লিপ্ত ছিলেন। রুশদের বিরুদ্ধে পাকতিয়া প্রদেশের জারমাত জেলায় কয়েকটি লড়াইয়ে তিনি অংশগ্রহণ করেন। সেই সময় তিনি গারদিজের প্রতিরক্ষা মোর্চায় এক হামলায় যখমিও হয়েছিলেন।

যখন আবদুর রশিদ দোস্তমের কমিউনিস্ট জুম্বাশ মিলিশিয়ারা জারমাত জেলায় হামলা করে, তখন মোল্লা সাইফুর রহমান মানসুর সাহেব একটি জিহাদি গ্রুপের

জিম্মাদার ছিলেন। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জিহাদে আফগানিস্তান বিজয়ী হলে মোল্লা সাইফুর রহমান মানসুর গারদিজে নিজের বাড়িতে চলে আসেন।

তারপর যখন মৌলবি নাসরুল্লাহ মানসুর দুশমনের এক কাপুরুষোচিত হামলায় শহীদ হন, তখন মোল্লা সাইফুর রহমান মানসুরের ওপর মুজাহিদ সঙ্গীদের দেখাশোনা এবং গ্রুপের জিম্মাদারিসহ পারিবারিক জিম্মাদারিও চেপে বসে। সেই সঙ্গে পাকতিয়ার গারদিজের পঞ্চদশ পৃষ্ঠপোষকের দায়িত্বও ছিল, যা মৌলবি মানসুর শহীদের মুজাহিদ সঙ্গীদের মধ্যেও বড় মনে করা হতো। এই দায়িত্বগুলোর মধ্যে এলাকার শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঠিক রাখা ও মুজাহিদ সঙ্গীদের সামরিক ও পরিচালনা-সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনাও করতে হতো। একবার তিনি এলাকার চোর-ডাকাতদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হন। তখন তাঁর এক হাতের তিনটি আঙুল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

যখন ব্যাপক ফেতনা-ফাসাদের বিরুদ্ধে তালেবান ও দীনি উলামায়ে কেরাম সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করে, তখন মোল্লা সাইফুর রহমান মানসুর ও তাঁর সঙ্গীরা একদিন কান্দাহার যান। তার পর পরই তিনি তাদের সমর্থনের ঘোষণা দিয়ে দেন। তাঁর সঙ্গীদের একটি গ্রুপ লড়াই চালিয়ে তালেবানের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য কান্দাহারের দিকে রওয়ানা হয়ে যায়। তারা খরনি ও শিলগড় হয়ে মুকির নামক জায়গায় পৌঁছে। এরই মধ্যে তালেবানরাও সেই এলাকায় পৌঁছে যায়। তারপর তারা আপসে একত্র হয়ে গজনীর দিকে অগ্রযাত্রা শুরু করে। যখন গজনীতে হামলা করতে যাচ্ছিল, তখন মোল্লা সাইফুর রহমান মানসুর পাকতিয়ার দিক থেকে নিজে বেশকিছু ট্যাঙ্ক ও সশস্ত্র সঙ্গীদের নিয়ে আক্রমণে অংশগ্রহণ করেন। সেই আক্রমণ মোল্লা সাইফুর রহমান মানসুরের পক্ষ থেকে ইমারাতে ইসলামিয়ার অধীনে প্রথম আক্রমণ ছিল। গজনী বিজয় হওয়ার পর ইমারাতে ইসলামিয়া ট্যাঙ্ক ও তোপখানার দায়িত্ব মোল্লা সাইফুর রহমান মানসুর ও তাঁর সঙ্গীদের হাতে সোপর্দ করে দেয়। কারণ, মোল্লা সাহেব ও তাঁর সঙ্গীরা এই বিভাগের ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোক ছিলেন।

তারপর তিনি গজনীতে থাকা ট্যাঙ্কগুলো সামলে নেন এবং এভাবে কান্দাহার থেকেও কিছু ট্যাঙ্ক গজনীতে নিয়ে আসেন। তারপর মোল্লা সাইফুর রহমান মানসুর ময়দান শহর, লুগার ও চাহার আসিয়াবে ইমারাতে ইসলামিয়ার বিজয়ী যুদ্ধগুলোতে অংশগ্রহণ করেন। এসব এলাকা বিজয়ের পর কাবুল বিজয়ের আগে পাকতিয়ার উর্গুন নামক এলাকায় পরী নামক এক বদমাশের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করেন। এরপর তিনি ইমারাতে ইসলামিয়ার জিম্মাদারগণের একটি আক্রমণে এক গ্রুপের কমান্ডার হিসেবে পাকতিয়া থেকে সফর শুরু

করেন। সেই লড়াইয়ে জাজাই, স্পিনাহ্ শেগাহ্, আজরাহ ও হিসারাক এলাকায় শরিয়াতে ইসলামী চালু করেন। তারপর জালালাবাদও দখল করে নেন। এর পরই কাবুল বিজয় হয় এবং আহমদ শাহ্ মাসউদকে পাঞ্জশিরের 'দিলানে সঙ্গ' পর্যন্ত পিছু হটিয়ে দেওয়া হয়।

কাবুল বিজয়ের পর মোল্লা সাইফুর রহমান 'করগাহ' সেনা ছাউনির পয়েন্ট-৮-এর সহযোগী এবং ট্যাঙ্ক বিভাগের জিম্মাদার হিসেবে কাজ শুরু করেন। আফগানিস্তানে ক্রুসেডারদের হামলা পর্যন্ত মোল্লা সাহেব এসব দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। এই সময়ের মধ্যে কাবুলের উত্তরাঞ্চলীয় রণাঙ্গনগুলোতেও লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেন তিনি। দীর্ঘদিন পর্যন্ত দাররায়ে শুকরের সম্মুখ রণাঙ্গনের জিম্মাদার থাকেন।

উত্তরাঞ্চলে ইমারাতে ইসলামিয়ার সব অগ্রযাত্রায় মোল্লা সাইফুর রহমান মানসুর সাহেবও শাহাদাতের তামান্নায় অংশগ্রহণ করেছেন। ১৯৯৮ সালে যখন ইমারাতে ইসলামিয়ার মুজাহিদীন সালঙ্গ সুরঙ্গ অতিক্রম করে, তখন মোল্লা সাইফুর রহমান মানসুর ও তাঁর সঙ্গীরাও সেই মহান যুদ্ধে শরিক ছিলেন। তখন মোল্লা সাইফুর রহমান মানসুর পুলখমরীর কাছে 'নজবুক রেবাতগ' নামক এলাকায় পেটে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারাত্মক যখমি হন। তাৎক্ষণিক তাঁকে চিকিৎসার জন্য হেলিকপ্টারের মাধ্যমে কাবুল পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সুস্থ হওয়ার পর আবারও তিনি রণাঙ্গনে ফিরে আসেন। কাবুলের দাররায়ে শুকর এলাকায় দায়িত্ব পালনের সময় মর্টার গোলার বেশকিছু টুকরার আঘাতে তাঁর ডান হাতের কবজির হাড্ডি ভেঙে যায়। এতে তাঁর একটি হাত সম্পূর্ণ বেকার হয়ে যায়। আবার বাম হাতেরও তিনটি আঙুল আগেই বিচ্ছিন্ন হয়ে কেবল দুটি আঙুলই বাকি ছিল। কয়েকবার লাগাতার যখমি হওয়ার কারণে তাঁর উভয় হাতের অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। পরবর্তী সময়ে উত্তরাঞ্চলে আক্রমণের সময় যখন মোল্লা সাহেব তাঁর সঙ্গীদেরসহ দুশমনের ঘেরাওয়ে পড়ে যান, তখন বের হওয়ার একটি মাত্র পথই বাকি ছিল। ফলে তিনি গৌরবন্দের দিকে অগ্রযাত্রা শুরু করেন। সেখানে তার মাথাও যখমি হয়ে যায়। কিন্তু তখন যখমের পরিমাণটা তুলনামূলক কম ছিল।

মোল্লা সাহেবকে আল্লাহ তাআলা ছোটবেলা থেকেই তাকওয়া, উত্তম আখলাক ও দীনদারির মতো উত্তম গুণাবলি দান করেছিলেন। তাঁর উত্তম আখলাকের কথা যদি বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়, তাহলে আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। তাই মাত্র কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হচ্ছি।

তাঁর এক বন্ধু কারী আকমল বলেন, 'মোল্লা মানসুর সাহেবের ১৩ বছর বয়সের এক ঘটনা। তখন তিনি গুজরানওয়ালার মাদ্রাসায়ে আরাবিয়ায় পড়ালেখে করছিলেন। রাতে খুবই ঠাণ্ডা পড়ত। রাতে যখন আমার ঘুম ভাঙে তখন মোল্লা সাহেব তাঁর বিছানায় ছিলেন না। আমি চিন্তিত হয়ে পড়ি। তাঁর খোঁজে বাইরে বের হই। কোথাও তাঁকে খুঁজে পাইনি। অবশেষে মাদ্রাসার ছাদে গিয়ে দেখি তিনি এই প্রচণ্ড শীতের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদ পড়ছেন। আমি তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে যাই। সালাম ফেরানোর পর তিনি কেঁদে কেঁদে দোয়া করতে শুরু করেন। আমি শীতে কাবু হয়ে নিচে চলে আসি। তারপর ফজরের পর সকালে তাঁকে জিজ্ঞেস করি, আপনি কোথায় ছিলেন। তখন তিনি বললেন, দিল পেরেশান হয়ে গিয়েছিল। তাই ক্লান্তি দূর করতে গিয়েছিলাম।'

তাঁর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ আছে যে তিনি যখমি অবস্থায়ও তাহাজ্জুদ ছাড়তেন না। তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদ গুজার মুত্তাকি বুজুর্গ ছিলেন। মোল্লা সাইফুর রহমান মানসুর সাহেব নিজে মুত্তাকি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য সঙ্গীদেরও তাকওয়া অর্জনের জন্য বলতেন। তিনি বলতেন, 'ব্যস, একবার নিজের নফসকে পায়ের নিচে পিষে ফেলো, দেখবে তোমাদের কখনো কোনো সমস্যা সামনে আসবে না।'

মুফতি ফয়েজ মুহাম্মদ সাহেব বলেন, মোল্লা সাইফুর রহমান মানসুর সাহেব ছোটবেলা তাঁর পিতার সঙ্গে একবার দাওয়াতে যান। মেজবান খাবারদাবার সামনে দিলে তিনি খাবার খাননি। মেজবান মনে করছিল যে হয়তো তিনি রোজা রেখেছেন। পরবর্তী সময়ে যখন বাড়ি ফিরে এলেন তখন খাবার খেলেন এবং বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি ওই লোকের খাবার কেন খেলেন? আগে তো এই লোক হারাম কাজে লিপ্ত ছিল। তার পিতা তাঁকে বোঝালেন, বর্তমানে সে তওবা করেছে। এখন সে মুজাহিদীনের অনেক সহযোগিতা করে।

লড়াই চলাকালে মোল্লা সাহেব যখন দ্বিতীয়বার যখমি হন, তখন তাঁর কবজির হাড্ডি একদমই অকেজো হয়ে গিয়েছিল। একবার মোল্লা সাহেব আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর মুজাহিদ দা.বা.-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য কান্দাহার যান। আমিরুল মুমিনীন তাঁকে বলেন, আপনার হাতের চিকিৎসার জন্য বাইরের কোনো রাষ্ট্রে পাঠিয়ে দিই। এর জবাবে মোল্লা সাহেব বলেন, আমি প্রসিদ্ধ সার্জেন মুসা ভিরদাগের সঙ্গে পরামর্শ করে নিই। যদি বাইরের রাষ্ট্রে চিকিৎসা করালে আমার হাত অস্ত্র চালনায় উপযোগী হয়ে যায়, তাহলে আমি মেনে নেব। নতুবা অযথাই বায়তুল মালের অর্থ কেন খরচ করা হবে?

ডাক্তার মুসা তাঁকে বলেন, বাইরের রাষ্ট্রে গিয়ে চিকিৎসা করানো হলে আপনার হাত হালকা-পাতলা নড়াচড়া করা যাবে। কিন্তু অস্ত্র চালনার উপযোগী হবে না। তাই মোল্লা মানসুর সাহেব চিকিৎসার জন্য বাইরের রাষ্ট্রে যেতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, অযথাই বায়তুল মালের অর্থ নষ্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই।

তাঁর এক বন্ধু কারী হাবীব সাহেব মোল্লা সাইফুর রহমান মানসুর সাহেবের সরকারি মাল খরচ করার ব্যাপারে তাঁর সীমাহীন পরহেজগারির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

'আন্দোলনের দায়িত্ব পালনের সময় তাঁর ভাইয়ের বিবাহ চলে আসে। যেখানে মোল্লা সাইফুর রহমান মানসুর সাহেব অংশগ্রহণ করেননি। আমি তাকে শরিক না হওয়ার কারণ জানতে চাইলে প্রথমে তিনি বলতে চাননি। কিন্তু আমার সীমাহীন মিনতির পর তিনি বলেন, যদি আমি বিয়েতে চলে যেতাম তাহলে আমি আমার গাড়িতে করেই যেতাম। তারপর সেখানে সেই গাড়ি মেহমানদের আনা-নেওয়ায় ব্যবহার করা হতো। আর আমি চাই বায়তুল মালের এই গাড়ি ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার না করা হোক।'

শরিয়তের পাবন্দি

জারমাত জেলার এক মৌলবি সাহেবের সঙ্গে মোল্লা সাইফুর রহমান মানসুর সাহেবের বহু পুরনো বন্ধুত্ব ছিল। তাঁর সেই বন্ধুর সঙ্গে এই এলাকার আরো দুজন লোক ছিল। যারা মোল্লা সাহেবকে বহু আর্থিক সহযোগিতাও করেছে। একবার তাদের ওপর এক ঘুষখোরির সত্য কেইস প্রমাণিত হয়ে যায়। মোল্লা সাহেব তাদের সবাইকে কাবুল করগাহ ছাউনিতে তাঁর বিশ্রামকক্ষে ডেকে পাঠান। তারপর তাদের সেখান থেকে নিজের গাড়িতে করে ফৌজি আদালতে নিয়ে যান। সেখানে তাদের শাস্তি হয়। এই কাজের মাধ্যমে মোল্লা সাহেব এ কথা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে আল্লাহ তাআলার আইন ও শরিয়তের অনুসরণের মোকাবিলায় তাঁর সামনে আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব ও সম্পর্কের কোনোই গুরুত্ব নেই।

জিহাদের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক

কারী হাবিবুল্লাহ বলেন, কমিউনিজমের বিরুদ্ধে জিহাদের সময় তাঁর বিয়ের দিন চলে আসে। আর তখন মোল্লা সাহেব জিহাদি প্রশিক্ষণ লাভে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর

পিতা কয়েকবার তাঁকে সংবাদ পাঠান যে এখন তুমি বাড়িতে চলে আসো। কিন্তু জিহাদের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক মহব্বত ছিল। ফলে তিনি বাড়িতে আসেননি। অবশেষে একদিন তাঁর পিতা নিজেই গাড়ি নিয়ে এসে তাঁকে জোর করে হাত ধরে বাড়িতে নিয়ে যান। বাড়ি যাওয়ার পথেও তিনি তাঁর বাবার সঙ্গে এই অনুরোধই করতে থাকেন যে জিহাদের প্রশিক্ষণ লাভ করা আমার খুবই প্রয়োজন।

শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা

মৌলবি জাকিরুল্লাহ জাকির বলেন, কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার সময় গারদিজের প্রতিরক্ষা মোর্চাগুলোতে হামলার আগে মোল্লা সাইফুর রহমান সাহেব শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষায় নিজের থুঁতনি নিজেই বেঁধে নেন। কিন্তু সেই হামলায় মোল্লা সাইফুর রহমান সাহেব শহীদ হননি। তবে যখমি হয়েছিলেন।

মোল্লা সাইফুর রহমান শহীদ রহ. চার ছেলে রেখে গিয়েছিলেন, যাঁরা এখনো দীনি ইলম অর্জন করছেন। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করছি, তিনি যেন তাঁদের ওপর মোল্লা সাইফুর রহমানের বরকত সব সময় রাখেন। তাঁরা যেন শহীদ পিতার মতো দীন ও জিহাদের স্তম্ভ হয়ে গড়ে ওঠেন। আমিন ইয়া রাব্বুল আলামিন।

آسماں تیری لحد پہ شبنم افشانی کرے
سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے

আসমান তোমার কোলে পর্দা বিছিয়ে দিক মসলিনের
সবুজ শ্যামল প্রান্তর পাহারাদারি করুক এই ঘরের ।

মাওলানা আবদুল হান্নান জিহাদওয়াল শহীদ রহঃ.

আবদুল হান্নান জিহাদওয়াল ১৯৬৪ সালে আফগানিস্তানের কান্দাহার মারকাজের দক্ষিণ দিকে ৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত জেলা খাকরিজের 'লাম' এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। কান্দাহারের খাকরিজ জেলার এক দীনদার পরিবারে জন্ম নেওয়া এই নওজোয়ানকে পিতা-মাতা ইলমে দীনের জন্য ওয়াকফ করে দেন। কিন্তু ১৫ বছর বয়সে তিনি নিজের কিতাবপত্র গুছিয়ে মাতা-পিতার অগোচরে রণাঙ্গনে চলে যান। প্রথমে কম বয়সী হওয়ায় মুজাহিদীন তাকে জিহাদের সারিতে দাঁড়ানো থেকে বাধা দেয়। কিন্তু বয়সস্বল্পতা তাঁর জিহাদের স্পৃহায় প্রতিবন্ধক হতে পারেনি। তিনি রুশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই শুরু করেন। রুশদের পতনের পরও তাঁর জিহাদের স্পৃহা ঠাণ্ডা হয়নি। তিনি কমিউনিস্টদের পেছনে ধাওয়া করতে শুরু করেন। জিহাদি স্পৃহা তাঁকে নতুন পথ দেখায়। আফগানিস্তানের সীমান্ত পার হয়ে তাজিকিস্তানে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করেন। দুই বছর পর্যন্ত সেখানে জিহাদ চালানোর পর আফগানিস্তানে চলতে থাকা কমান্ডারদের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যান। তিনি 'মা আরাআন নাহার', আরব বিশ্ব, আফ্রিকা মহাদেশ ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুহাজির মুজাহিদীনের সঙ্গে সময় অতিবাহিত করেন। যখন আমেরিকানরা এই দেশে আগ্রাসন শুরু করে, তখন তিনি নতুন উদ্যোমে জিহাদ শুরু করেন। জাবেল, কান্দাহার ও হেলমন্দের ময়দানি ও পাহাড়ি উত্থান-পতনে কয়েকবার দুশমনের সঙ্গে মোকাবিলা করেন। অবশেষে হেলমন্দের গ্রিসকে তাহাজ্জুদের সময় আমেরিকান বিমানের বোম্বিংয়ে শহীদ হয়ে যান। মৌলবি আবদুল হান্নান রহ.-এর আত্মাও আমাদের অন্যান্য মুজাহিদীনের মতো কয়েক যুগ ধরে চলা জিহাদি সফরে ক্লান্তির শিকার হয়নি। এই পথে শত শতবার দীর্ঘ সফর, কষ্ট ও পেরেশানিতে তাঁর দেহ ক্লান্ত হয়ে ভেঙে পড়ে, কিন্তু তার হিম্মত ও সাহসে কোনো ভাটা পড়েনি। তাঁর অস্থির আত্মা তখন প্রশান্তি পায়, যখন তাঁর দেহ উড়ে যায়। হ্যাঁ, মহান আত্মাগুলো এমনই হয় যে তাদের দেহ তাদের অস্থিরতার বোঝা ওঠাতে ব্যর্থ হয়ে যায়।

إذا كانت النفوس كبارا

تعب في مرادها الأجسام

যখন আত্মাগুলো মহান হয়,

দেহগুলো উদ্দেশ্য পূরণে ক্লান্ত হয়।

তিনি যখন কৈশোরকাল থেকে যৌবনের করিডরে পা রাখেন, তখন আফগানিস্তানে কমিউনিজম ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু হয়ে গিয়েছিল। হেলমন্দ, কান্দাহার ও জাবেল ইত্যাদি প্রদেশে বীরত্ব প্রদর্শন চলছিল। তিনি উর্গান্দাবে মোল্লা শিরীন আখুন্দের অধীনে জিহাদি জীবন শুরু করেন। উর্গান্দাবে জিহাদের সময় তিনি গুরুতর আহত হয়েছিলেন। তাজিকিস্তানে জিহাদের সময় তিনি বন্দিও হয়েছিলেন। সেখানে রাশিয়ানরা তাঁর ওপর নির্মম জুলুম চালিয়েছিল। কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি অটল থাকেন। তাজিকিস্তানে তৃতীয়বারের মতো যখমি হয়েছিলেন। তা ছাড়া তিনি সেখানে মুজাহিদীনের ট্রেনিংয়ের জন্য ট্রেনিং সেন্টারও স্থাপন করেছিলেন। দুই বছর পর সেখান থেকে তিনি আফগানিস্তানে ফিরে আসেন।

শহীদ হাফেজ বদরুদ্দীন হক্কানী (রহ.)

আমাদের গর্বযোগ্য ইতিহাসের পরতে পরতে গর্বযোগ্য ব্যক্তিত্বের অবস্থান রয়েছে। সেসব ব্যক্তিত্ব ও ঐতিহাসিক লোকদের মধ্যে কিছু লোক ইলমে তাসাউফ, সাহিত্য-সংস্কৃতি, সামাজিক সেবা ও অন্যান্য বিভাগে উঁচু পর্যায়ের ভূমিকা রেখেছেন। আবার বহু লোক এমন রয়েছে, যারা জিহাদের নির্ভীক মুজাহিদ, যাদের নাম নিয়ে আজ মুসলমান গর্ববোধ করে।

ইতিহাসজুড়ে যেমন মহান ব্যক্তিত্ব ও গর্বযোগ্য জিহাদি খান্দান রয়েছে, ঠিক তেমনি আজও মুসলিম উম্মাহ সেই গর্বে সৌভাগ্যমান। দেশজুড়ে বহু এমন জিহাদি খান্দান রয়েছে, যারা নিজেদের নওজোয়ানদের দীনের হেফাজত ও শাহাদাতের ধারাকে বহাল রাখতে জিহাদের ট্রেনিং করায়। যাদের গোটা জিন্দেগি আল্লাহর দীনের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছেন। এ ধরনের গর্বযোগ্য, দীনদার ও জিহাদি খান্দানগুলোর মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য একটি খান্দান, আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পূর্ব এলাকা পাকতিয়ায় অবস্থিত, দুই উপনিবেশবাদকে পরাজিতকারী খান্দান, মহান মুজাহিদ মৌলবি জালালুদ্দীন হক্কানীর খান্দান।

এই খান্দানের কুরবানি শুনে এবং জেনে পশতু কবি খোশহাল খান খটকের কবিতার কথা মনে পড়ে যায়।

ہمارے چھوٹے بڑے سب قبروں میں شہید ہو کر گیے

یہ ہنر پشت در پشت نسل در نسل ہمارے پاس ہے۔

ছোট-বড় সবাই শহীদ হয়ে কবরে গেছে,
এই গুণ আমাদের, বংশের পর বংশজুড়ে রয়েছে।

নিচে সেসব গাজি ও শহীদানের খান্দানের এক গর্বিত সন্তান হাফেজ বদরুদ্দীন শহীদের জীবন ও কর্মের সংক্ষিপ্ত আলোচনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

রণাঙ্গনের নেতা, দ্বিতীয় ইমাম শামিল উপাধিপ্রাপ্ত এক ব্যক্তিত্ব জালালুদ্দীন হক্কানীর ঘরে ১৪০৬ হিজরির রমজানুল মুবারকের বরকতময় মাসে উত্তর ওয়াজিরিস্তানের মীরানশাহ এলাকায় হিজরতের সময় এক সন্তান জন্ম নেয়, যার নাম রাখা হয় বদরুদ্দীন।

হাফেজ বদরুদ্দীন হক্কানী প্রাথমিক শিক্ষা, আদব আখলাক ও আকিদা-বিশ্বাস তাঁর মুজাহিদ পিতার কাছেই গ্রহণ করেন। দশ বছর বয়সেই তিনি কুরআন মাজিদ হিফজ করে ফেলেন এবং সেই সঙ্গে জামাতে শশমও পাস করেন।

হাফেজ বদরুদ্দীন হক্কানী হিফজ শেষ করার পর দীনি ইলম অর্জন ও পূর্ণ করার জন্য জামিয়ে মামবাউল উলুম, খায়বার ও পখতুনখাহর বিভিন্ন মাদ্রাসায় পড়ালেখা করতে থাকেন। তা ছাড়া ইমারাতে ইসলামিয়ার যুগে তিনি বিশেষ করে তাঁর পিতার কাছে কিছু কিতাব অধ্যয়ন করেন, যা সপ্তম শ্রেণির শেষ পর্যন্ত চালু থাকে।

আফগানিস্তানের ওপর আমেরিকান আগ্রাসনের সময় বদরুদ্দীন হক্কানী যৌবনের করিডরে কেবল পা রেখেছিলেন। তিনি তাঁর খান্দানের ধারা জারি রেখে জিন্দেগির অন্যসব ব্যস্ততা ফেলে রেখে জিহাদের স্পৃহায় উদ্বেলিত হয়ে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হওয়াকেই পছন্দ করেন।

প্রথমে তিনি একজন সাধারণ মুজাহিদ হিসেবেই পাকতিয়া, পাকতিকা ও খোস্তের রণাঙ্গনগুলোতে দুশমনের বিরুদ্ধে জিহাদি কার্যক্রম শুরু করেন। গেরিলা যুদ্ধে কিছুদিন কাজ করার পর তাঁকে ফেদায়ি হামলার একটি পয়েন্টের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি তাঁর শাহাদাতের দিন পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

কুফরকে তছনছকারী ফেদায়ি হামলা

হাফেজ বদরুদ্দীন হক্কানীকে ইমারাতে ইসলামিয়ার মেধাবী, বিচক্ষণ ও কার্যকর সামরিক ব্যক্তিদের মধ্যে গণনা করা হতো। গত ১২ বছরে তিনি তাঁর গবেষণার

মাধ্যমে পরিকল্পিত টার্গেট ও সফল হামলার মাধ্যমে দুশমনকে অসংখ্যবার বিধ্বস্ত করেছেন। কাবুল, বাগরাম, পাকতিয়া, খোস্ত, ময়দান, ভিরদাক ও অন্যান্য এলাকায় বদরুদ্দীন হক্কানীর নতুন পদ্ধতিতে করা আক্রমণ ও সেগুলোর ব্যাপারে দুশমনের স্বীকৃতির মাধ্যমে আমাদের এই দাবি প্রমাণিত হয়।

বদরুদ্দীন হক্কানীর পরিকল্পিত সফল আক্রমণে জানবাজ মুজাহিদীনের হাতে দুশমনকে কয়েকবার ক্ষতিগ্রস্ত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে হয়েছে। তিনি তাঁর জিন্দেগিতে ৭৫টি ভিন্ন ধরনের বড় বড় ফেদায়ি হামলা করিয়েছেন, যেগুলোর মধ্যে বাগরাম, কাবুল ও খোস্তের মতো বড় অপারেশনগুলোও ছিল। সহরাবাগে অবস্থিত আমেরিকান মারকাজ, দুমন্দু জেলায় আক্রমণ, ইন্টারকন্টিনেন্টাল এবং কাবুলের নওগাওয়ায়ের ইয়াজে তিনি পূর্ণ দক্ষতার সঙ্গে সফল হামলা করিয়েছেন, যার ফলে দুশমনের জান-মালের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

হাফেজ বদরুদ্দীন হক্কানী শহীদ রহ. তাঁর কর্মদক্ষতা, বীরত্ব ও পরিকল্পনার কারণে আমেরিকার ব্লাক ও হিট লিস্টে গণনা হতে থাকেন। আমেরিকা সর্বদা তাঁর পেছনে লেগে থাকে। কয়েকবার তারা ব্যর্থ হয়েছে। অবশেষে তিনি ২০১২ সালের ২৪ আগস্ট আমেরিকান ড্রোন হামলায় অন্য মুজাহিদ সঙ্গীদের সঙ্গে শাহাদাতের মহান মর্যাদায় ভূষিত হন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

যে কারণে দাজ্জালি শক্তিগুলো মুজাহিদদের শত্রু

দাজ্জালি শক্তিগুলো মুজাহিদদের শত্রু মনে করে। মুজাহিদদের নাম শুনলেই তারা আঁৎকে ওঠে। কারণটা কী? মুজাহিদদের কাছে না আছে বিপুল জনশক্তি, না আছে আধুনিক শিক্ষা, না আছে প্রযুক্তি, না আছে আণবিক বোমা, না আছে জীবাণু অস্ত্র। তাহলে এর কারণটা কী যে পাহাড়ে-জঙ্গলেও দাজ্জাল ও তার অনুসারীরা তাদের সহ্য করতে পারছে না? সব দাজ্জালি শক্তি তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ও নিজেদের মায়েদের বুক খালি করার জন্য আফগানিস্তানের মাটিতে এসেছে। এখন তারা কফিন ভরে ভরে আপন আপন দেশে ফিরে যাচ্ছে। প্রশ্ন হলো, তাদের সঙ্গে আমাদের আসল শত্রুতাটা কী?

ইবলিসের সবচেয়ে বড় শত্রুতা বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ সা.-এর সঙ্গে। বর্তমানে ইবলিসের মূল প্রচেষ্টা হলো, দাজ্জাল ও তার শক্তিগুলো জিতে যাক, যাতে উম্মতে মুহাম্মাদিয়াকে আল্লাহর চোখে ব্যর্থ দেখাতে পারে। সত্য ও

মিথ্যার এই লড়াই অব্যাহত রয়েছে। ইবলিস মিথ্যার শক্তিগুলোর মাধ্যমে পৃথিবী থেকে সত্যের বিনাশ ঘটাতে চাচ্ছে।

ইবলিস, তার ক্রীড়নক ও ইহুদিদের যুদ্ধ পুরোপুরি আল্লাহর তাকদিরের বিরুদ্ধে অহমিকা ও হঠকারিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তার চিন্তা হলো, এই যুদ্ধে জেতার জন্য সবার শেষে তার সর্ববৃহৎ শক্তি দাজ্জালকে নিয়ে আসবে, যে কিনা সারা পৃথিবী থেকে সত্য ও কল্যাণের শক্তিগুলো নিশ্চিহ্ন করে তার নিজের শাসন প্রতিষ্ঠিত করবে।

মহান আল্লাহ এই যুদ্ধে তাঁর বান্দাদের পরীক্ষা করছেন, তাঁর ওয়াদাগুলোর ওপর কে বিশ্বাস রাখে আর কে তাঁর ওয়াদার কথা ভুলে গিয়ে ইবলিসের প্রতারণার জালে আটকে যায়।

এই পরীক্ষা সম্পর্কে আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনের এক জায়গায় নয়, বহু জায়গায় বলেছেন–

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ

'তোমরা কি মনে করেছ, তোমরা এমনিতেই জান্নাতে ঢুকে যাবে; অথচ আল্লাহ এখনো সপ্রমাণিত করেননি তোমাদের কারা জিহাদ করেছে এবং সপ্রমাণিত করেননি ধৈর্যশীলদের? *[সুরা আলে ইমরান : ১৪২]*

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন–

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ.

'মানুষ কি মনে করেছে, আমরা ইমান এনেছি বলাতেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তাদের পরীক্ষা নেওয়া হবে না? আমি তো তাদের আগেকার লোকদের পরীক্ষা নিয়েছি। কাজেই আল্লাহ অবশ্যই সপ্রমাণিত করবেন তাদের, যারা সত্য বলেছে এবং সপ্রমাণিত করবেন তাদেরও, যারা মিথ্যাবাদী। *[সুরা আনকাবুত : ২-৩]*

ফায়দা : এ কথাটি আল্লাহ সেই লোকদের ব্যাপারে বলছেন, যারা নিজেদের মুসলমান দাবি করে যে সর্বাবস্থায়ই এই পরীক্ষা দিতে হবে, যাতে সত্যবাদী ও

মিথ্যাবাদীদের, মুমিন ও মুনাফিকদের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে যায়। যেমন হাদিসে আছে, মুমিনদের পরীক্ষা হবে, কালেমার দাবি কে কতখানি আদায় করেছে।

এ অবস্থায় প্রতিজন মুসলমানকে ভাবতে হবে এ লড়াই আসলে কিসের জন্য। শয়তান ও তার অনুসারীরা মুহাম্মদ সা.-এর দীনকে পৃথিবী থেকে মুছে দিতে চায়। অপরদিকে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো মুজাহিদরা তাদের প্রত্যয়-পরিকল্পনাগুলো ব্যর্থ করে মানবতার নবী দীন ও মর্যাদা রক্ষায় নিজেদের জীবনগুলো উৎসর্গ করে দিতে বদ্ধপরিকর। কাজেই এটা ইসলাম নির্মূল ও ইসলাম রক্ষার যুদ্ধ। একদিকে ইবলিস ও তার অনুসারীর দল, অপরদিকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের জন্য নিবেদিত মুমিনের দল।

মুজাহিদদের অপরাধ, তারা ইমানের পক্ষে মাঠে নেমেছে। তারা ইবলিসের পরিকল্পনাগুলো ভণ্ডুল করে দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু তারা এই মিশন নিয়ে কাজ করুন আল্লাহ ও তার শত্রুরা এই অনুমতি তাদের দিতে রাজি নয়। তারা মুজাহিদদের ওপর বিষাক্ত গ্যাস ছুড়ছে। আগুনের বৃষ্টিবর্ষণ করছে। কিন্তু ইসলামের পতঙ্গগুলো তার পরও জিহাদের পথ থেকে পেছনে সরছে না। তাদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত, জীবন দেব; তবু ময়দান ছাড়ব না। কিউবার পিঞ্জর তাদের এই স্পৃহাকে অবদমিত করতে পারেনি। শেবেরগানের হায়েনাদের হিংস্রতা তাদের সাহসের বুক এতটুকুও খালি করতে পারেনি; বরং আমরা দেখতে পাচ্ছি, নিপীড়ন যত বাড়ছে, মুজাহিদদের সাহস ও প্রত্যয় ততই শাণিত হচ্ছে।

দীন প্রতিষ্ঠার এই লড়াই শেষ ধাপে প্রবেশ করতে চাচ্ছে। ইবলিস তার সব শক্তি তাদের বিরুদ্ধে একত্র করে ফেলেছে। ইবলিসকে মহান আল্লাহর একটি কথা বলা আছে, 'আমার নেক বান্দারা থাকতে তুই তোর বাসনা পূরণ করতে পারবি না। তোর মিশন সফল হবে না। এরা যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীতে থাকবে–হোক সংখ্যায় অতি নগণ্য–তোর সব শক্তি অকার্যকর হয়ে যাবে। আমার ও আমার বন্ধুর পথে নিবেদিত সেই লোকগুলোর মর্যাদা আমি অনেক উঁচু করে দেব, আর তোকে লাঞ্ছনার গভীর খাদে নিক্ষেপ করব। তারা না ইবলিসের শক্তিগুলোকে ভয় পাবে, না বিত্তের মোহ তাদের দীনের পথ থেকে সরাতে পারবে। দুনিয়ার মায়া তাদের পায়ের শিকল হবে না। মৃত্যুর ভয় তাদের পা টলাতে পারবে না; বরং মৃত্যুর আগ্রহ তাদের এমন দেওয়ানা বানিয়ে দেবে যে বড় বড় শিক্ষিতরাও তাদের পাগল বলবে। মৃত্যুকে ধরার জন্য তারা মৃত্যুর পেছনে পেছনে দৌড়াবে, আর মৃত্যু তাদের থেকে পালাবে। কিন্তু

প্রেমশূন্য হৃদয় আর আলোশূন্য বিবেক প্রেম ও কুরবানির এই ধারা বুঝতে পারবে না।

সুতরাং আজ যদি নমরুদের আগুন দাউদাউ জ্বলে থাকে, তাহলে ইবরাহিমি প্রেমও ঢেউ খেলছে। যেখানে যেখানে আগুন আছে, সেখানে পতঙ্গও আছে। কাশ্মীর-ফিলিস্তিন, ইরাক-আফগানিস্তান, চেচনিয়া-আলজেরিয়া। আর এখন বোধহয় যুগের নমরুদ আগুনের এই কুণ্ডকে পাকিস্তানেও জ্বালাতে চাচ্ছে। ঠিক আছে, জ্বালাও। প্রেমের ঝরনাও এখানে প্রবহমান। পঙ্গপালেরও অভাব নেই এখানে। শখ আছে তো এসে পড়ো।

মুহাম্মদ সা.-এর প্রেমিকরা দীনের জন্য জীবন কুরবান করে আমাদেরও আহ্বান জানাচ্ছে এই বাহিনীতে শামিল হতে। আল্লাহওয়ালারা আল্লাহর বাহিনীর দিকে ডাকছে, আর দাজ্জালের চেলারা ডাকছে দাজ্জালের বাহিনীর দিকে।

ও হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীরা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় এখনো হয়নি? না হয়ে গেছে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এখনই এসে পড়েছে। দাজ্জালের আত্মপ্রকাশের আগে যে যে পথ বেছে নেবে, দাজ্জালের সময় সেই পথের ওপরই অটল থাকবে। যারা দাজ্জালের আগমনের আগে হজরত মাহদির বাহিনীতে যুক্ত হয়ে যাবে, দাজ্জাল তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

আমরা কী চাই, আর দাজ্জাল কী চায়

মুহাম্মদ সা.-এর উম্মতের বিরুদ্ধে ইবলিসের আশা–ভরসার সর্বশেষ অবলম্বন হলো দাজ্জাল। দাজ্জালের মাধ্যমে ইবলিস দীনে মুহাম্মদীর অবসান ঘটিয়ে পৃথিবীতে তার ইবলিসি ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কিন্তু বিপুল শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও দাজ্জাল সংশয় ও দোদুল্যমানতার আস্ত একটা মূর্তি। সে তার আত্মপ্রকাশের আগে এমন প্রতিটি শক্তির অবসান চায়, যে তার পথে সামান্যও উদ্বেগ দাঁড় করাতে পারে। সারা পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ, খাদ্যোপকরণ, পানির ব্যবস্থাপনা ও সামরিক শক্তি–মোট কথা সবকিছুর ওপর সে তার নিয়ন্ত্রণ চায়। সে চায়, সামরিক দিক থেকে তার পথে কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকুক। পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রে তার বানানো 'নতুন বিশ্বব্যবস্থা' (New World Order) কার্যকরভাবে চালু হয়ে যাক। প্রতিটি দেশ তার বানানো বাণিজ্যনীতি তার প্রতিষ্ঠান (IMF) আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সঙ্গে লেনদেন চালু করুক। দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে সারা বিশ্ব তার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার

ওপর ইমান আনুক। বিশেষ করে মুসলমানরা ইসলামী খেলাফতের চিন্তা মাথা থেকে বের করে দিক এবং কারো মনে যদি এমন চিন্তা থাকেও, বাস্তবায়নের শক্তি তার না থাকুক।

পশ্চিমা বিশ্ব দাজ্জালের আপন। ইবলিসি ব্যবস্থা যা-ই হোক সমাজবাদ হোক বা পুঁজিবাদ– পৃথিবীটা একমেরু হোক বা দ্বিমেরু; তাতে তার কিছুই যায়-আসে না। অবশ্য দুটিই তার হওয়া চাই। তার আসল প্রতিপক্ষ ইসলামী ব্যবস্থা ও জিহাদি শক্তি। ১৯৯১ সালের পর পৃথিবীর মঞ্চে আমরা এমন একটি ঘটনা ঘটতে দেখছি, যদি তার প্রতি অন্তরের চোখ খুলে তাকাই, তাহলে বলা যায়, এই শক্তিটির বর্তমানে দাজ্জাল আত্মপ্রকাশের সাহস দেখানোর প্রশ্নই আসে না। পৃথিবীর যেকোনো ভূখণ্ডে ইসলামী শাসনের আলোচনা-ই ইবলিস ও দাজ্জালের প্রাণ বের করে দেয়। কোথাও যদি তা বাস্তবায়িত হয়ে যায়, তাহলে তাতে তাদের সব আশা, সব পরিকল্পনা ও শ্রমের ওপর দিয়ে পানি গড়িয়ে গেছে বলে মনে হয়।

১৯৯৬ সালে তালেবান রক্তের নজরানা পেশ করে আল্লাহর পথে জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন চালু করেছিল। তালেবানের ইসলামী শাসন ছিল বিশ্বময় দাজ্জালি শাসনের পূজারিদের জন্য মৃত্যুর পয়গাম। তারা জানত, সুদের অকল্যাণে জর্জরিত ব্যবসায়ীরা যদি ইসলামী বাণিজ্যনীতির বরকত ও সুফল দেখে ফেলে, তাহলে তারাও আপন আপন রাষ্ট্রে ইসলামী শাসন দাবি করে বসবে। স্বাধীনতা ও সমতার স্লোগান তুলে নারীজাতিকে অপদস্ত করা হয়েছিল। তালেবান ক্ষমতার স্লোগান তুলে নারীজাতিকে অপদস্ত করা হয়েছিল। তালেবান ক্ষমতায় এসে মহিলাদের মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল, যাকে ইংরেজ নারীরাও স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিল এবং তালেবানের আদর্শ ও চরিত্রে মুগ্ধ ও প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ইবলিস ও দাজ্জালের সাজানো বিশ্বমঞ্চ লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে বলে পরিলক্ষিত হচ্ছিল। কিন্তু শুরুতে ইবলিসের ধারণা ছিল, অন্যান্য মুসলিম শাসকদের মতো তাদেরও তার জাদুর বোতলে ভরে ফেলতে সক্ষম হবে। ফলে প্রথমে দাজ্জাল যথারীতি তার আন্তর্জাতিক ব্যাংকারদের (IMF) মাধ্যমে আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ ওমরকে কাবু করার অনেক চেষ্টা করেছে। আর্থিক সাহায্যের প্রলোভন, যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানের পুনর্গঠন ও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো পুনর্বিন্যাসের জন্য তালেবানের কাছে তারা অনেক ধরনা দিয়েছিল। জাতিসঙ্ঘের দলের পর দল প্রতিনিধি শহীদের রক্তে রঞ্জিত আফগানিস্তানের মাটিকে এমন অপদস্তের মতো ঘুরে ফিরছিল, যেমনটা ঘুরঘুর করে অন্যান্য

দেশের মুসলিম শাসকরা ইউরোপ-আমেরিকায়। পশ্চিমা যে নারীদের তাদের পুরুষরা কখনো মর্যাদা দেয়নি, তালেবান তাদের বোনের মর্যাদা দিল এবং হিজাব ও ওড়না দিয়ে তাদের পবিত্র মাটিতে নামাল। জাতিসঙ্ঘের কতিপয় হঠকারী কর্মকর্তা ওখানেও তাদের মহিলাদের উলঙ্গ রাখতে চাইল। কিন্তু বোনদের ভাইয়েরা তাদের মতিগতিও ঠিক করে দিল। এহেন টানাপড়েনের মধ্যেও দাজ্জালি শক্তিগুলো তাদের উত্তরাঞ্চলীয় জোটকে বেশ কবার কাবুলের ওপর লেলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তারা ব্যর্থ হলো এবং ব্যর্থতার গ্লানি বুকে ধারণ করেই দুনিয়া থেকে চলে গেল।

দাজ্জালি শক্তিগুলোর এসব প্রচেষ্টার মধ্যেই ১৯৯৮ সাল এসে হাজির হলো। কিন্তু এত দিনেও তারা কোনো সফলতা দেখতে পেল না; বরং ইসলামী শাসনের ক্রিয়া প্রকাশ পেতে শুরু করল। আলেমরা কিতাবের দুই মলাটের মাঝে আবদ্ধ ইসলামী শাসনের বাস্তব রূপ চোখে দেখার জন্য জিহাদ-ভূমিতে আসতে শুরু করলেন। বিশ্বের নানা দেশ থেকে ব্যবসায়ীরা এই ইসলামী শাসনে অংশগ্রহণের জন্য আফগানিস্তানের দিকে মুখ করলেন। দীনে মুহাম্মদীর পাগলরা দলে দলে পাহাড়ের উঁচু পথে হাঁটতে হাঁটতে আফগানিস্তানে এসে নামতে শুরু করল। তালেবানবিরোধী অপপ্রচার ক্রমে স্তিতিম হতে শুরু করল। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, তালেবান থেকে নিরাশ হয়ে ইবলিস ও দাজ্জাল ১৯৯৯ সাল থেকেই তাদের নতুন পরিকল্পা আঁটল এবং সারা বিশ্বে প্রতিটি দেশে একটা করে পুতুল সরকার বসানোর মিশন নিয়ে মাঠে নামল। তাদের সেই পরিকল্পনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুটি ছিল পাকিস্তানের পারভেজ মোশাররফ। তালেবানের পতন ঘটিয়ে দাজ্জাল কাবুলের শাসনক্ষমতায় একটা পুতুল সরকার বসানোর পরিকল্পনা ১৯৯৮ সালেই হাতে নিয়েছিল। তবে তার প্রচেষ্টা ছিল, দাজ্জালি শক্তিগুলো তালেবানের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার আগেই আরব মুজাহিদদের কাবুল থেকে তাড়িয়ে দেবে। কিন্তু মহান আল্লাহ আরব মুজাহিদদের হাতে দাজ্জালের পরিকল্পনাগুলোর ওপর আরেকবার পানি ছিটিয়ে দিলেন। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের আমেরিকা আক্রমণ মূলত দাজ্জালের পরিকল্পনাগুলোকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিল এবং তাদের সর্ব পরিকল্পনা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল।

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড মিলহাউস নিক্সন তাঁর রচিত Victory Without War ('ভিক্টরি উইদাউট ওয়ার')-এ লিখেছেন–

'১৯৯৯ নাগাদ আমেরিকা সমগ্র বিশ্বের শাসক হয়ে যাবে। এই বিজয় তারা যুদ্ধ ছাড়াই অর্জন করবে। তারপর মাসিহ (দাজ্জাল) রাজত্বের ভার গ্রহণ করে নেবে। যেন উল্লিখিত সাল নাগাদ মাসিহর সব আয়োজন সম্পন্ন হয়ে যাবে আর

আমেরিকার দায়িত্ব সেসব আয়োজন-ব্যবস্থাপনাকে সম্পন্ন করা পর্যন্ত। তারপর শাসন খোদ মাসিহ চালাবে।'

দাজ্জাল কে হবে? ১৯৯৯ সাল থেকে যে লোকটি আমেরিকায় শাসন করেছেন, তাঁর নাম ডিক চেনি। এই পুরো আমলে প্রতিটি সিদ্ধান্ত- চাই তা অভ্যন্তরীণ হোক বা বৈদেশিক, করের ব্যাপার হোক বা আফগানিস্তান আক্রমণ, আমেরিকায় কোনো চোরকে রক্ষা করা হোক বা ইরাক আক্রমণ সবার বিরোধিতা সত্ত্বেও বুশ সেই সিদ্ধান্তের ওপরই স্বাক্ষর করেছেন, যেটি ডিক চেনির মুখ থেকে বের হয়েছে। এমনকি কোনো কোনো সময় এফবিআইর ডিরেক্টর পদত্যাগের হুমকি দিয়েছেন; কিন্তু ডিক চেনির কথা নিজেরটাই মানতে বাধ্য করেছেন। গোয়ান্তানামো, বাগরাম ও আবুগারাইব ইত্যাদিতে মুজাহিদ বন্দিদের সঙ্গে শয়তানি আচরণের আদেশ ডিক চেনির মুখ থেকেই বের হয়েছিল। আর সেটা মুক্তচিন্তা ও স্বাধীনতার ধ্বজাধারী আমেরিকার আইন হয়ে গেছে। 'সচেতন' মার্কিন জনসাধারণ তো দূরের কথা, কলিন পাওয়েল ও 'কালো জাদুকরনী' কন্ডোলিৎসা রাইস পর্যন্ত বিষয়টি জানতে পেরেছেন দুই বছর পর। তাও সংবাদপত্রের মাধ্যমে। শুনে দুজন খুবই ক্ষুব্ধ হলেন। কিন্তু ডিক চেনির সামনে কারুর মুখ খোলার সাহস হয়নি। ইট-পাথর সব গিয়ে পড়েছে মি. বুশের ওপর। কারণ, তিনি ছিলেন স্রেফ একটা দাবার ঘুঁটি।

ডিক চেনির ব্যাপারে আসরার আলমের দাবি হলো, তিনি দাজ্জালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং দাজ্জাল খোদ তাঁকে নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

এখন প্রশ্ন থাকল, দাজ্জালের ব্যাপার তো বলা হয়েছে, তার কাছে সব ধরনের শক্তি থাকবে এবং সে বিশ্বময় তার শাসন প্রতিষ্ঠিত করবে। এর উত্তর হলো, দাজ্জালের বিশেষ যে শক্তির কথা হাদিসে এসেছে, তা সে খোদায়িত্বের ঘোষণার পর ব্যবহার করবে। আল্লামা বিন হাজর আসকালানি ফাতহুল বারিতে লিখেছেন, 'দাজ্জালের মাধ্যমে অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হওয়া তার খোদায়িত্বের ঘোষণার পরে ঘটবে।'

নতুন বিশ্বধর্মের জন্য পথ কিরূপ সমতল করা হলো এবং দাজ্জালের আগমনের লক্ষ্যে কেমন প্রস্তুতি আছে, তার একটি বিবরণ পাঠ করুন।

'আমেরিকার জন্য জরুরি হলো, সে যেন জাতিসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে এমন একটি বাহিনী গঠনে সহযোগিতা দেয়, যারা খুব দ্রুততার সঙ্গে নড়াচড়া করতে পারে। সেই বাহিনীর সংখ্যা প্রথম ধাপে ষাট হাজার হবে এবং ১২টি দেশের সমন্বয়ে তা গঠিত হবে। *[সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোসেফ নাই-এর নিবন্ধ থেকে, নিউ ইয়র্ক টাইমস : ২ ফেব্রুয়ারি : ১৯৯২]*

'যদি সত্যিকার বিশ্বনিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করতে চাই, তাহলে না লাল বাহিনীর প্রয়োজন হবে, না মার্কিন বাহিনীর। এর জন্য প্রয়োজন একাধিক রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত একটি নীল বর্ণের জানবাজ আন্তর্জাতিক সামরিক শক্তি। এই বাহিনীই পারবে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করতে। এ কথা বলাবাহুল্য, ইহুদিরা নীল রংকে দাজ্জালের বিশ্বশাসনের প্রতীক মনে করে। *[সূত্র : নিউ ইয়র্ক টাইমস : ১১ ফেব্রুয়ারি : ১৯৯২]*

আবদুল্লাহ ইউসুফ আজ্জাম (রহ.)

'টাইম ম্যাগাজিন আবদুল্লাহ আজ্জামকে অভিহিত করেছিল' বিংশ শতাব্দীতে জিহাদের পুনর্জাগরণের রূপকার বলে। দখলদারিত্বের ভেতরে জীবনযাপন করার প্রকৃত রূপ কী, তা ফিলিস্তিনে জন্ম নেওয়া আবদুল্লাহ আজ্জামের খুব ভালোভাবেই জানা ছিল। অল্প বয়স থেকেই আব্দুল্লাহ আজ্জাম ছিলেন চিন্তাশীল ও কর্তব্যপরায়ণ। এই কর্তব্যপরায়ণতাই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল ষাটের দশকের জর্ডান থেকে ইসরায়েলের দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনের জিহাদে যোগ দিতে।

কিন্তু তৎকালীন ফিলিস্তিনের বিদ্রোহীদের অধিকাংশই ছিল জাতীয়তাবাদী, যারা ইসলামকে একেবারেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করত না। আল্লাহর ইবাদত করার বদলে তাঁদের সময় কাটত তাস খেলে আর গান শুনে। এসব কিছুই ছিল আবদুল্লাহ আজ্জামের অপছন্দনীয়।

একদিন কথাচ্ছলেই তিনি এক সহযোদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন, ফিলিস্তিনের এই বিপ্লবের ধর্ম কী? যার জবাবে যোদ্ধাটি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং রূঢ়ভাবে তাঁকে জানিয়ে দিল, এই বিপ্লবের কোনো ধর্ম নেই। এই ঘটনার পরে ফিলিস্তিনের তৎকালীন বিপ্লবের ওপর থেকে তাঁর মন পুরোপুরিভাবে উঠে গেল। তিনি সৌদি আরবে চলে গেলেন সেখানকার বিশ্ববিদ্যালগুলোতে শিক্ষকতা করার উদ্দেশ্যে।

আফগান জিহাদের ডাক শোনামাত্রই তিনি ছুটে গিয়ে সেই ডাকে সাড়া দিলেন এবং পরবর্তী সময়ে তাঁর সারা জীবন, তাঁর সারা অস্তিত্বকে উৎসর্গ করলেন মুসলিম উম্মাহকে এই জিহাদের দিকে আহ্বান জানানোর জন্য। তিনি শপথ করেছিলেন, কোনোভাবেই জীবিত অবস্থায় আফগানিস্তানের মাটি ছেড়ে না যাওয়ার। তাঁর আশা ছিল আফগানিস্তানের মাটিতে আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা করার অথবা শাহদাতের। আফগান জিহাদে যোগ

দেওয়ার জন্য সমগ্র বিশ্ব থেকে আগত মুজাহিদদের সাহায্য-সহযোগিতা দেওয়ার লক্ষ্যে ওসামা বিন লাদেনের সঙ্গে মিলে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন 'বাইত আল আনসার' (সাহায্যকারীদের আবাস)

আফগান জিহাদের প্রতি মুসলিম উম্মাহকে আহ্বান জানানোর জন্য তিনি ছুটে গেলেন বিশ্বের এক কোনা থেকে আরেক কোনায়। সারা পৃথিবী ঘুরে ঘুরে তিনি মুসলিমদের বলতে শুরু করলেন ইসলাম ও মুসলিম ভূমি রক্ষার উদ্দেশ্যে একত্র হওয়ার পবিত্র দায়িত্বের কথা। সমগ্র পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর জিহাদের দাওয়াত। এসব বিষয়ে তিনি বেশকিছু বই লিখলেন।

বয়সের কোটা খুব বেশি হয়নি–চল্লিশের কোটা পার হয় হয়, এ সত্ত্বেও তিনি সক্রিয়ভাবে সরাসরি আফগান জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। জিহাদের উদ্দেশ্যে তিনি ছুটে বেড়ান সমগ্র আফগানিস্তান, কখনো পূর্ব থেকে পশ্চিমে, কখনো বা উত্তর থেকে দক্ষিণে। রোদ-ঝড়-শীতকে উপেক্ষা করে পাহাড় পাড়ি দিয়ে, কখনো ঠাণ্ডা বরফের ওপর পায়ে হেঁটে, কখনো বা গাধার পিঠে চড়ে। এই দুর্গম যাত্রাপথে অনেক সময় তাঁর তরুণ সঙ্গীরা ক্লান্ত হয়ে পড়লেও, কোনো ক্লান্তিই আবদুল্লাহ আজ্জামকে স্পর্শ করত না।

তিনি জিহাদ করেছিলেন সব উপায়েই। তিনি সাড়া দিয়েছিলেন আল্লাহর ডাকে–

> انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَٰلِكُمْ
> خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

> তোমরা বের হয়ে পড়ো স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সঙ্গে এবং জিহাদ করো আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে, এটি তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।
> *[সুরা আত তাওবা : ৪১]*

নিজ পরিবারকেও তিনি এই একই আদর্শে গড়ে তুলেছিলেন। এমনকি তাঁর স্ত্রী পর্যন্ত ইয়াতিমদের রক্ষণাবেক্ষণ ও মানবসেবামূলক কাজের মাধ্যমে আফগান মুসলিমদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর কাছে অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চাকরির প্রস্তাব এলেও তিনি তার সবই ফিরিয়ে দিতেন। তিনি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন শাহাদাত অথবা শত্রুর হাতে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তাঁর জিহাদ থামবে না। এবং তিনি বারবার এই কথা বলতেন যে শেষ পর্যন্ত তাঁর লক্ষ্য হলো ফিলিস্তিনকে মুক্ত করা। তিনি সব সময় বলতেন, অন্য কোনো জাতির পক্ষে কখনো মুসলিমদের পরাজিত করা সম্ভব না। আমরা মুসলিমরা

কখনো আমাদের শত্রুদের কাছে পরাজিত হই না; বরং আমাদের পরাজয় ঘটে আমাদের নিজেদের হাতেই।

ওসামা বিন লাদেন আফগানিস্তানে এসে প্রথমেই আবদুল্লাহ আজ্জামের কাছে গেলেন এবং তাঁরা দুজন একসঙ্গে কাজ করা শুরু করলেন।

এই সেই কিশোর

কৈশোরের শেষ দিকে এসে ওসামা শুনতে পেলেন রাশিয়ানরা আফগানিস্তান আক্রমণ করেছে এবং এর ফলে মৃত্যুবরণ করেছে দশ লক্ষাধিক আফগান। এ খবর জানার পর অন্য আরো অনেক মুসলিম আরবের মতো তিনি আফগানদের জন্য আর্থিক সহায়তা জোগার করলেন এবং তাদের সাহায্য করার লক্ষ্যে আফগানিস্তান চলে গেলেন। আফগানিস্তানে তার সঙ্গে দেখা হলো আবদুল্লাহ আজ্জামের। আবদুল্লাহ আজ্জাম আরব মুজাহিদীনদের থাকা-খাওয়া এবং অন্যান্য সাহায্য-সহযোগিতা করতেন এবং ওসামা সৌদি আরব থেকে এর জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্যের জোগান দিতেন। আবদুল্লাহ আজ্জামের উদ্দেশ্য ছিল আফগানিস্তানের মুসলিমদের রক্ষা করা এবং সেখানে এমন একটি ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা, যার মাধ্যমে ইসলামের সত্যিকারের পুনর্জাগরণের শুরু হবে। মুসলিম বিশ্বের তাগুত শাসকরা ১৯২৪ সালে উসমানি খিলাফতের পতনের পর থেকেই বিভিন্ন কৌশলে প্রকৃত ইসলামিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাকে বাধা দিয়ে আসছিল, এমনকি সৌদি আরব, যেখানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শারিয়াহ আইন পালন করা হতো, প্রকৃতপক্ষে ছিল পশ্চিমা বিশ্বের অধীন একটি অনুগত দালাল রাষ্ট্র। পরে (২০০০ সাল ও তার পরে) আল-কায়েদার মূল লক্ষ্য হলো কোনো ভূখণ্ডে পরিপূর্ণ ইসলামিক রাষ্ট্র (খিলাফাহ) প্রতিষ্ঠার আগে সব ধরনের পশ্চিমা আধিপত্যকে সেই ভূখণ্ড থেকে অপসারণ করা।

যে সময়ের কথা হচ্ছে সে সময়টাতে আমেরিকা ও সৌদি আরব উভয়ই ছিল জিহাদের পক্ষে। কারণ আমেরিকার উদ্দেশ্য ছিল সুপারপাওয়ার হিসেবে তাদের একমাত্র প্রতিপক্ষ সোভিয়েত রাশিয়াকে যেকোনো মূল্যে সরিয়ে দেওয়া। এ জন্য যদি গরিব আফগানদের অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিতে হয়, তাতেও আমেরিকা রাজি ছিল। এর ফলে আফগানরা গেরিলা যুদ্ধ, বোমা তৈরি, শত্রুর বিরুদ্ধে নাশকাতমূলক কার্যক্রম ও সমরাস্ত্র ব্যবহারে প্রশিক্ষণ লাভ করে। কিন্তু যা এই সময় আমেরিকার জানা ছিল না তা হলো, এই আফগানদের মাধ্যমেই পরবর্তী সময়ে তাদের নিজেদের পতনের সূচনা হবে। [*এই লেখাটি সরাসরি ইন্টারনেট* *Black*

Flags From The East, Black Banners Come Out of Khurasan Nathing Will Stop Them. Until They Are Raised In Jerusalem এ অংশ থেকে নেওয়া]

মুসলমানরা লাঞ্ছিত হওয়ার কারণ ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নেওয়া

হ্যাঁ, এ ব্যাপার আল্লাহর রাসুল সা. অনেক আগেই বলে গেছেন যে যখনই তোমরা পূর্ববর্তী পথভ্রষ্ট জাতিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তখনই তোমরা লাঞ্ছিত হতে থাকবে। এবং দাজ্জালি শক্তিগুলো তোমাদের গ্রাস করে নিতে থাকবে। দেখুন হাদিসটি কী বলে–

> عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتّٰى لَوْ دَخَلُوْا فِىْ جُحْرِ ضَبٍّ لَا تَّبَعْتُمُوْ هُمْ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلْيَهُوْدَوَالنَّصَارٰى؟ قَالَ فَمَنْ؟

> হজরত আবু সাঈদ খুদরি রা. হতে বর্ণিত,, তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিঃসন্দেহে তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জামানার লোকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে সমান সমানভাবে। উদাহরণস্বরূপ বলেন, এক হাত এক হাত ও এক বিঘত এক বিঘত করে। এমনকি যদি তারা কোনো গুঁইসাপের গর্তেও প্রবেশ করে থাকে, তবে তোমরাও তাদের অনুসরণার্থে সেখানে প্রবেশ করবে। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, পূর্ববর্তী লোকদের বলতে আপনি কি পথভ্রষ্ট ইহুদি আর খ্রিস্টানদের বোঝাচ্ছেন? উত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তা না হলে আর কারা?

এখন যদি আমরা এ হাদিসের দিকে একটু খেয়াল করি তবে কী দেখতে পাই!....বর্তমান মুসলমানদের মধ্যে বেশির ভাগ ওই সব দোষ বা ত্রুটিই পরিলক্ষিত হচ্ছে, যা পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। জিনা-ব্যবিচার, মদ্যপান, জুয়া, বেইমানি, অন্যায়ভাবে হত্যা, আল্লাহর কালামে বিকৃতি সাধন, নবী করিম সা.-এর জীবনেতিহাস ও শিক্ষাদীক্ষাকে ভিন্ন ধাঁচে বিশ্লেষণ

ইহুদিদের মতো ধর্মের ওই সব বিষয়ে শুধু আমল করা, যা মনের অনুকূলে হয়, আর যেগুলোকে কঠিন মনে করা হয়, সেগুলোকে দূরে নিক্ষেপ করে দেওয়া, এতিম-বিধবাদের মাল অন্যায়ভাবে খেয়ে ফেলা, নেতৃস্থানীয় লোকদের ভয়ে বা শিল্পপতি লোকদের থেকে পয়সা অর্জনের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নাজিলকৃত বিধানের মনমতো ব্যাখ্যা করা ইত্যাদি। এসবের দ্বারা কি আদৌ ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে?

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلاَّ اِسْمُه
وَلا يَبْقَى مِنَ الْقُرْاٰنِ اِلَّا رَسْمُه يَعْمُرُوْنَ مَسَاجِدَ هُمْ وَهِيَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ
خَرَبٌ شَرُّ اَهْلِ ذَالِكَ الزَّمَانِ عُلَمَائُهُمْ مِنْهُمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَاِلَيْهِمْ تَعُوْدُ.

হজরত আলী রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অচিরেই মানুষের ওপর এমন সময় আসবে, যে সময় ইসলামের নামটি ছাড়া আর কিছুই বাকি থাকবে না। শুধু নামে থাকবে, কোনো ক্ষেত্রেই এর বাস্তবায়ন হবে না। কুরআনের শুধু শব্দ ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। (যা বিধানগুলো বাস্তবায়ন হবে না।) তখন লোকেরা মসজিদ নির্মাণ করবে, কিন্তু মসজিদগুলো আল্লাহর স্মরণ থেকে খালি থাকবে। ওই সময়ের সর্বনিকৃষ্ট লোক হবে আলেমরা। কারণ, তাদের থেকেই ফেতনার সূচনা হবে এবং তাদের কাছেই তা ফিরে যাবে। *[তাফসিরে কুরতুবি : খণ্ড : ১২, পৃ : ২৮০]*

যদিও বর্তমানে পৃথিবীতে মুসলমানদের সংখ্যা ১৫০ কোটিরও বেশি। কিন্তু ইসলামের অবস্থা কী? অসংখ্য মুসলিম রাষ্ট্র বিদ্যমান, কিন্তু কোথাও কুরআনের শাসন প্রতিষ্ঠিত নেই। মুখের মাধ্যমে তো কালেমা উচ্চারিত হচ্ছে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, আল্লাহ ছাড়া কাউকে বিচারক মানা যাবে না। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি হচ্ছে, আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে অজস্র মাবুদ (বিচারক) বানিয়ে রাখা হয়েছে। সেজদায় পড়ে আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করার মতো লোক তো অনেক আছে, কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, আল্লাহর নাজিলকৃত পরিপূর্ণ শাসনব্যবস্থাকে তারা গণতান্ত্রিক কুফুরি শাসনব্যবস্থার বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে। পবিত্র যে কালেমা মুসলমানরা পড়ে থাকে, সেটি হচ্ছে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে একটি প্রতিশ্রুতি যে আল্লাহ তাআলা ছাড়া প্রতিটি শক্তি, প্রতিটি বিধান ও প্রতিটি কুফুরিকে অস্বীকার করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকা। প্রকাশ্যে মুখে মুখে বা স্বীয় কার্যকলাপের মাধ্যমে ওই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কাজ করে যাওয়া। কিন্তু

আজকালের মুসলমান আল্লাহ তাআলাকেও সন্তুষ্ট রাখতে চায়, পাশাপাশি কুফুরিকেও অসন্তুষ্ট করতে চায় না। কুরআনে কারিমে এসব ব্যক্তির পরিচয় এভাবেই বর্ণিত হয়েছে–

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ

> এটা (এই ভ্রান্তি) এ জন্য যে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, যারা (অর্থাৎ কুরআন) তা অপছন্দ করে, তাদের তারা বলে, আমরা কিছু কিছু বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব। *[সুরা মুহাম্মাদ : ২৬]*

অর্থাৎ, আমরা কুরআনের কিছু মানব, কিছু মানব না। তোমরা যতটুকুর অনুমতি দেবে, ততটুকু মানব, আর যা অমান্য করতে বলবে, তা অমান্য করব। আল্লাহ এরূপ মুসলমানদের ভ্রান্ত ও বিপথগামী বলে ঘোষণা করেছেন।

উল্লিখিত হাদিসে 'উলামা' দ্বারা উদ্দেশ্য 'অসৎ আলেম'। অর্থাৎ আলেমদের মধ্যে কিছু লোক এমন হবে যে ওই সময়ের মানুষদের মধ্যে তারা হবে সর্বনিকৃষ্ট। তারাই ফেতনার জন্ম দেবে আর এই ফেতনার আগুনে তারাই পুড়ে মরবে। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবি (রহ.) বলেছেন, 'কারো মনে যদি বনী ইসরাইলের আলেমদের অবস্থা জানার শখ জাগে, তাহলে সে যেন তার যুগের 'ওলামায়ে ছু'দের দেখে নেয়।'

এরা যেমন, ওরাও তেমনই ছিল।

> ওহে মুসলমান ভাইয়েরা, আল্লাহপাক রাব্বুল আলামিন এই ধর্মকে রাসুল সা.-এর ওপর কোনো প্রকার সন্দেহ বা অস্পষ্টতা রেখে নাজিল করেননি; বরং তা সূর্যের আলো অপেক্ষা অধিকতর জ্যোতির্ময়, চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের চেয়েও বেশি উজ্জ্বল এবং আমাদের অস্তিত্বের চেয়েও বেশি বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে একে আল্লাহ পূর্ণ করে দিয়েছেন। আল্লাহপাক রাব্বুল আলামিনের ওই ধর্মই পছন্দ, যা তিনি চৌদ্দ শ বছর আগে তাঁর প্রিয় হাবীব রাসুলে আরাবি সা.-এর ওপর অবতীর্ণ করেছিলেন, পাশাপাশি সাহাবায়ে কেরাম রা. বুকের তাজা রক্ত দিয়ে পৃথিবীর বুকে তা প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে তাবেইন, তাবে তাবেইন, মুফাসসিরিন, মুহাদ্দিসিন ও ফুকাহায়ে কেরাম স্বীয় জিন্দেগিকে এর জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। উম্মতের ওই সব মহামনীষী দীনকে সঠিকরূপে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে রক্তের

> সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন। আর এ ধারা সাহাবা যুগেও ছিল,
> অদ্যাবদি আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকবে।
> একটি দল এটি করেই যাবে, এটিই আল্লাহর ফায়সালা।

যুগের প্রতাপশালী শাসকবর্গের মুখে লাথি মেরে তাদের উচিত শিক্ষা দিয়েছিলেন। কখনো দরসে বসে...আর কখনো ঘোড়ার পিঠে চড়ে। নিজের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা এই দীনের জন্য কুরবান করে দিয়েছিলেন। তারা আমাদের মতো ছিলেন না যে দুনিয়াও কামাই হবে, আর দীনও না ছুটবে। তারা তাদের রবের কাছে শুধুই আখিরাত কামনা করেছিলেন এবং জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জান-মালকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন।

এসব ত্যাগ-তিতিক্ষা আর কুরবানির বিনিময়ে আজও আমাদের পর্যন্ত এ মহান ধর্ম সঠিকরূপে পৌঁছেছে। দুনিয়ায় যত বড় জ্ঞানীই পয়দা হোক, কখনো সে আল্লাহর হালালকৃত বিষয়গুলো হারাম করতে পারবে না। আর যাকে আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন, তা হালাল বানাতে পারবে না। কোনো জামাতের আমির, শায়েখ বা কোনো বুজুর্গের এ অধিকার নেই যে সে নবী কারিম সা.-এর আনীত ধর্মকে পরিবর্তন করে নিজের চাহিদামতো ঢেলে সাজিয়ে নেবে, চাই সে যত বড়ই বাহাদুর বা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তি হোক। এমন অহংকারী ফেরাউন এবং নিজেকে খোদা বলে দাবিকারীদের উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য যুগে যুগে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হকের জন্য সর্বস্ব ত্যাগকারী তৈরি করেছেন, যারা নিজেদের জান বাজি রেখে এই মহান দীনকে আসল চেহারায় রেখেছেন। তারা আল্লাহর হালালকৃত বিষয়গুলো হালাল ও হারাম বিষয়গুলোকে হারাম সাব্যস্ত করেই ছেড়েছে, যদিও এতদুদ্দেশ্য বাস্তবায়নে পৃথিবীর সব মানুষের সঙ্গে তাদের লড়াই করতে হয়েছে, কাটা ঘায়ে নুন ছিটানোর মতো কথা শুনতে হয়েছে। সব কলশক্তি ও মৌখিক শক্তি এদের বিরুদ্ধে চতুর্দিকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে দিয়েছে। তারা কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হয়নি। পূর্ববর্তী উলামায়ে হক তাদের যা শিখিয়ে গেছেন, তারা তাতেই অটল রয়েছে; বরং তাদের আগের উলামায়ে হক তো তাদের দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তরে রক্ত ঝরিয়ে স্বীয় ছাত্র ও মুরিদদের সামনের দিকে চলার সাহস জুগিয়েছে।

যার একটি উদাহরণ মোল্লা ওমর

এই যুবকই সেই যুবক...!
কে এই যুবক...
হ্যাঁ ভাই এই যুবকই সেই যুবক...

যার নাম শুনলে আজও কাফিরদের বুক থরথর করে কেঁপে ওঠে...!

যার মিশন কোনো দিন ব্যর্থ হয়নি...

যিনি বন্দুকের নল দিয়ে বিমান পর্যন্ত বিধ্বস্ত করে দিতে পারতেন।

যার যুদ্ধাশ্রম ও কৌশল তৎকালীন রাশিয়ান প্রশিক্ষিত কুকুরগুলো পর্যন্ত থরথর করে কাঁপতে থাকত, যদি শুনতে পারত যে এ পথে মোল্লা ওমরের বাহিনী আসবে।

হ্যাঁ ভাই, এ হলো সেই যুবক, যে একেবারে সাধারণ ঘরের, কিন্তু খুবই ধর্মভীরু একটি পরিবার থেকে উঠে এসেছিলেন, যাকে ছোটবেলা থেকেই শেখানো হয়েছিল কোনো আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনী যদি মুসলিম ভূমির এক মুঠো পরিমাণ জমিও দখল করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। এসব পুরুষ ছিল জন্মসূত্রে যোদ্ধা, দুঃসাহসী ও নির্ভীক। তাদের আরব ভাইদের মতো তারাও ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবনাদর্শের কাছে মাথা নত করতে রাজি নয়, যে ইসলাম আফগানরা আজ থেকে প্রায় এক হাজার বছর আগে নিজেদের জীবনে গ্রহণ করেছে। আফগানিস্তানকে ডাকা হতো 'সাম্রাজ্যবাদের কবরস্থান'। পরবর্তী ৩০ বছরে বিশ্বের পরাশক্তিগুলোর সঙ্গে আফগানিস্তানের যুদ্ধ যেন এই নামটিকে ক্রমাগত পরীক্ষা করতে থাকে।

রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে জিহাদে ওমরের মতো অনেক যুবক অংশগ্রহণ করেছিল। এক লড়াইয়ে তার একটি চোখ গুলিতে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এটি তার মনোবলে একটুও চিড় ধরাতে পারেনি। এ ওমরই সেই ওমর, যিনি পরবর্তী সময়ে মোল্লা ওমর নামে পরিচিতি লাভ করে।

সুতরাং মুসলমানদের মনপূজা ছেড়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে মনোযোগ দিতে হবে এবং এমন হকপন্থীদের সঙ্গে সম্পর্ক কায়েম করতে হবে, যাদের কথা ও কাজ কোনো সময় এদিক-সেদিক হয় না, যারা নিজেদের পূজার দিকে নয়; বরং আল্লাহর ইবাদতের দিকে মানুষকে আহ্বান করে থাকে। দুনিয়ার ঘোর অন্ধকার থেকে বের করে আখিরাতের উজ্জ্বল স্থায়ী সফলতার দিকে নিয়ে যায়। সন্দেহের গর্ত থেকে বের করে বিশ্বাসের উপত্যকায় নিয়ে যায়। আল্লাহকে ছাড়া পৃথিবীর কোনো পরাশক্তিকেই ভয় করে না। বাতিলকে বাতিল বলে স্বীকৃতি দেওয়ার সাহস বুকে লালন করা, এ রকম হকপন্থী উলামারাই আল্লাহ তাআলার কাছে বেশি পছন্দের। যারাই তাদের পছন্দ করবে, আল্লাহ তাআলাও তাদের পছন্দ করবেন।

আজকাল প্রত্যেক জামাতই স্বীয় আলেমদের হকপন্থী আর অন্য আলেমদের উলামায়ে ছুঁ (বাতিলপন্থী) বলে দাবি করে। আসুন, ইমাম গাজালি রহ.-এর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ احیاء علوم الدین এর কিছু অংশ পড়ে নিই, যাতে বুঝে নিতে পারি যে কোনো বিশেষ জামাতের আমির হলেই বা কোনো বড় আলেম-শায়েখের সাহেবজাদা হলেই উলামায়ে হকের মধ্যে শুমার হবে না; বরং প্রত্যেকের নিজস্ব আমলই ফায়সালা করে দেবে যে সে কি উলামায়ে হক (আখিরাতকামী) নাকি উলামায়ে ছুঁ (দুনিয়ালোভী)।

রাসুলে কারিম সা. এরশাদ করেন, মানুষের মধ্যে নবীদের সবচেয়ে নিকটবর্তী স্তরে অবস্থান করবে উলামায়ে কেরাম এবং দীনের কাজে লড়াইকারী মুজাহিদীন। উলামায়ে কেরাম তাদের জ্ঞানের মাধ্যমে লোকদের সৎ পথের দিকে আহ্বান করে। পক্ষান্তরে মুজাহিদীন তাদের তরবারির মাধ্যমে দীন রক্ষায় জিহাদে লিপ্ত থাকে। নবীদের কাজও ছিল দুটি সত্য দীনকে মানুষের মাঝে প্রচার করা এবং কুফরি শক্তিকে পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া।

নবী কারিম সা. এরশাদ করেন, জ্ঞানীদের কলমের কালি কেয়ামতের দিন শহীদের রক্তের সঙ্গে ওজন করা হবে। অপর হাদিসে তিনি বলেন, আমার উম্মতের দুটি দল যদি সত্যের ওপর অটল থাকে, তবে সব মানুষ ঠিক থাকবে। তারা যদি খারাপ হয়ে যায়, সবাই খারাপ হয়ে যাবে। তারা হচ্ছে, আমার উম্মতের শাসক ও জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ।

আরেকটি হাদিসে রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সব মানুষকে পুনর্জীবিত করে উলামাদের উদ্দেশে বলবেন, হে আলেম সম্প্রদায়, তোমাদের আমি এ জন্য এলেম দান করিনি যে তোমাদের শাস্তি দেব। যাও, আজকে আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম। *[এ সুসংবাদটি হলো ওই হক, তথা সত্যপন্থী আলেমদের ব্যাপারে।]*

হজরত উসামা বিন জায়েদ রা. বলেন, আমি নবী কারিম সা.কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন যে কিয়ামতের দিন একজন আলেমকে হিসাব-কিতাব শেষে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। শাস্তির প্রচণ্ডতায় নাড়িভুঁড়ি তার বাইরে বেরিয়ে আসবে। সে এমনভাবে দৌড়াতে থাকবে, যেমন গাধা লাকড়ি নিয়ে দৌড়াতে থাকে। তার এ অবস্থা দেখে অন্য জাহান্নামিরা প্রশ্ন করবে, এ অবস্থা কেন? উত্তরে সে বলবে, দুনিয়াতে আমি অপরকে অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার আদেশ দিতাম; অথচ আমি নিজেই তার মধ্যে লিপ্ত থাকতাম। ভালো কাজের উৎসাহ দিতাম; আর নিজে ভালো কাজ থেকে বিরত থাকতাম।

ইমাম গাালি রহ. বলেন, আলেমদের অন্যায়ের দরুন কিয়ামতের দিন তারা দুই গুণ বেশি শাস্তি ভোগ করবে। কারণ তারা জানাসত্ত্বেও নাফরমানিতে লিপ্ত হয়েছে। এ কারণেই আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন বলেন, অবশ্যই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিচ স্তরে অবস্থান করবে। কেননা তারা জানার পরও অস্বীকার করেছে। ইহুদিদের আল্লাহ পাক খ্রিস্টানদের থেকেও বেশি নিকৃষ্ট বলেছেন। কারণ, ইহুদিরা এ কথা বলেনি যে আল্লাহ হচ্ছে তিনজনের একজন; বরং তারা সত্যকে ভালো করে জানার পরও তা অস্বীকার করেছে। তাই আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন–

يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ.

ইহুদিরা মুহাম্মদ সা.কে (সত্য নবী হওয়ার ব্যাপারে) এমনভাবে চেনে, যেমনভাবে তারা তাদের সন্তানদের চেনে। *[সুরা বাকারা : ১৪৬]*

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন–

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِينَ.

অতঃপর যখন তাদের কাছে পরিচিত সত্য আসল, তখন অস্বীকার করল। সুতরাং অস্বীকারকারীদের ওপর আল্লাহর লা-নত। *[সুরা বাকারা : ৮৯]*

নিঃসন্দেহে আলেমদের মধ্যে সফল ও আল্লাহর নিকটবর্তী তারাই, যারা সদা আখিরাতের ফিকির নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এমন আলেমদের কিছু নিদর্শন রয়েছে–

আখিরাত-অন্বেষী আলেমরা তাদের এলেমের মাধ্যমে দুনিয়া অর্জনে ব্যস্ত হবে না। কেননা সর্বনিম্নস্তরের আলেমও দুনিয়ার তুচ্ছতা, অনিষ্ঠতা ও ভরসাহীনতার কথা অন্তরে সৃষ্টি করে ফেলেছে। পাশাপাশি আখিরাতের উচ্চস্তরসমূহ, চিরস্থায়ী জিন্দেগির মালিকানা ও নেয়ামতের গুরুত্ব তার অন্তরসমূহ, চিরস্থায়ী জিন্দেগির মালিকানা ও নিয়ামতের গুরুত্ব তার অন্তরে বসিয়েছে। তারা বিশ্বাস করে যে দুনিয়া ও আখিরাত দুটি পৃথক পৃথক বিষয়, দুটিকে কখনোই একত্র করা সম্ভব নয়। যখনই দুটি থেকে কোনো একটিকে সন্তুষ্ট করা হবে, অপরটি তখন অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে। দাঁড়িপাল্লার দুটি অংশের মতো, যখনই একটি ভারী হবে, অপরটি হালকা হয়ে যাবে। আখিরাত-অন্বেষী আলেম এ কথা বিশ্বাস করবে যে দুনিয়া ও আখিরাতের দূরত্ব পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্বের মতো, যখনই একটির কাছে যাওয়া হবে, দ্বিতীয়টি দূরে চলে যাবে। দুটি পাল্লার মতো, যখনই একটিকে পূর্ণ করতে থাকবে, দ্বিতীয়টি খালি হতে থাকবে। সুতরাং যেসব আলেম দুনিয়ার নিকৃষ্টতা

ও কষ্টের পার্থক্য বুঝতে পারে না, তারা ফাসিদুল আকল, তথা বোধশক্তিহীন। কেননা, অভিজ্ঞতা এরই সাক্ষী দেয়।

সুতরাং ওই সব লোক আলেমদের মধ্যে কী করে শুমার হবে, যাদের ভেতরে বোধশক্তি পর্যন্ত নেই। আখিরাতের জিন্দেগিকে বড় ও স্থায়ী মনে করে না। বাস্তবে তারা তো কাফের, তাদের এলেমকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। ওই ব্যক্তি কী করে আলেমদের মধ্যে গণ্য হবে, যার ভেতরে কোনো ইমানই বিদ্যমান নেই। যারা এও অনুধাবন করতে পারে না যে দুনিয়া হচ্ছে আখিরাতের বিপরীত বিষয়। দুনিয়া ও আখিরাত এক সঙ্গে প্রচেষ্টা অপূরণযোগ্য এক ব্যর্থ প্রয়াস। সুতরাং যে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টিই অর্জন করতে চায়, সে সব নবী-রাসুলের শরিয়ত সম্পর্কে সম্পূর্ণ মূর্খ; বরং সে ৩০ পারা কুরআনকে অস্বীকারকারী। এমন ব্যক্তিদের কী করে আলেমদের মধ্যে গণ্য করা হবে যে আলেম এসব বিষয়কে ভালো করে বোঝা সত্ত্বেও দুনিয়ার পরিবর্তে আখিরাতকে প্রাধান্য না দেয়। বোঝা যাবে সে শয়তানের কাছে বন্দি। তার ভেতরে থাকা পশুত্বের চরিত্রগুলো তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং দুর্ভাগ্য তার ওপর প্রাধান্য পেয়েছে। এমন ব্যক্তিবর্গ উলামাদের কাতারে কী করে শকির হবে।

হযরত দাউদ আ.

হজরত দাউদ আ. সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে যে আল্লাহ তাআলা বলেন, যখন কোনো আলেম আমার মহব্বতের পরিবর্তে তার মনোবৃত্তিকে প্রাধান্য দেয়, তখন কমছে কম আমি তাকে এই শাস্তি দেই যে, আবাদতের মধুরতা থেকে তাকে বঞ্চিত করে দিই। হে দাউদ, আমার কাছে এমন আলেমদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিয়ো না, যাদের দুনিয়ার জিন্দেগি কাবু করে ফেলেছ। এমন আলেমই আমার মহব্বত থেকে তোমাকে বাধা প্রদান করবে। এসব লোক আমার বান্দাদের জন্য ডাকাতস্বরূপ। হে দাউদ, যখন তুমি এমন আলেমকে দেখো যে সে আমাকে পেতে চায়, আমাকে রাজিখুশি করার জন্য সে সব কাজ সম্পাদন করে, তুমি তার খাদেম হয়ে যাও।

হজরত হাসান রহ. বলেন, উলামাদের শাস্তি হচ্ছে অন্তর মরে যাওয়া। অন্তর মরে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে আখিরাতের আমলের মাধ্যমে দুনিয়া অন্বেষণ করা। হজরত ইয়াহইয়া বিন মুআজ রা. বলেন, যখন থেকেই জ্ঞান ও হেকমতের

মাধ্যমে দুনিয়া অন্বেষণ শুরু হয়েছে, তখন থেকেই জ্ঞানের সম্মান উঠে যেতে শুরু করেছে।

হজরত উমর রা. বলেন, যদি তুমি কোনো আলেমের মধ্যে দুনিয়ার মহব্বত প্রাধান্য দেখো, তখন তাকে দীনের ব্যাপারে অভিযুক্ত করো। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তি ওই কাজেই লিপ্ত হয়, যার প্রতি তার ভালোবাসা থাকে। হজরত ইয়াহইয়া বিন মুআজ রা. দুনিয়াদার আলেমের উদ্দেশ্যে বলেন–

يَاأَصْحَابَ الْعِلْمِ! قصور كُمْ قَيْصرية وَبَيوتِكُم كسروية وأثْوابكُم ظَاهِرِيَةِ. وَأَخْفَافكُمْ جَالُوتِيةِ وَمراكبكُمْ قَارونِيةِ وأَوانيكم فِرعَنية. وَمأثكُمْ جَاهِلِيَنَ وَمذاهِبِكُمْ شَيْطَانية فأَيْن الشريعة المحمدية.

হে জ্ঞানের বাহকগণ, তোমাদের প্রাসাদগুলো রুমের বাদশাহদের প্রাসাদগুলোর মতো। তোমাদের ঘরগুলো পারস্যের বাদশাহদের ঘরগুলোর মতো। তোমাদের পোশাক প্রকাশ্য (অহংকারী) লোকদের পোশাকের মতো। তোমাদের পায়ের জুতা জালুতি লোকদের জুতার মতো। তোমাদের বাহনগুলো কারুণের লোকদের সোয়ারির মতো। তোমাদের খাদ্যপাত্রগুলো ফেরাউনি লোকদের খাদ্যপাত্রের মতো। তোমাদের অপরাধগুলো অন্ধকার যুগের অপরাধের মতো এবং তোমাদের মাজহাব শয়তানি মাজহাবের মতো। তাহলে শরিয়তে মুহাম্মদিয়া কোথায় গেল।

হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, যে ব্যক্তি এলেম অন্বেষণ করল দুনিয়া অর্জনের আশায়, কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের (কাছে তো দূরের কথা) গন্ধও পাবে না।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন উলামায়ে ছুদের নিদর্শনে বলেছেন, স্বীয় এলেমের মাধ্যমে দুনিয়া অর্জনে ব্রতী হওয়া। আর উলামায়ে হকের নিদর্শনে বলেছেন, আল্লাহর জন্য সব কর্মে একনিষ্ঠতা প্রদর্শন ও দুনিয়া থেকে বিমুখ থাকা।

দুনিয়া-অন্বেষী আলেম উলামায়ে ছুদের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা বলেন–

وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ.

ওই সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন আল্লাহ তাআলা কিতাব প্রদানকৃত (ইহুদি-খ্রিস্টান)-দের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে তোমরা মানুষের কাছে কিতাবের প্রতিটি আয়াতকে সঠিকভাবে বর্ণনা করবে, কোনো আয়াতকে পোপন রাখবে না। অতঃপর তারা কিতাবকে পেছনে নিক্ষেপ করেছিল (যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করেনি) এবং স্বল্প লাভের আশায় বিধানগুলোকে বিক্রি করে দিয়েছিল। *[সুরা আলে ইমরান : ১৮৭]*

আর আখিরাত অন্বেষী আলেমদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র কালামে বলেন–

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.

আহলে কিতাব (ইহুদি-খ্রিস্টান)-দের থেকে অনেক লোক এমন রয়েছে, যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। শুধু আল্লাহকে রাজিখুশি করার জন্য তোমাদের ও তাদের ওপর নাজিলকৃত বিষয়গুলোকে সত্য বলে জানে। তারা দুনিয়ার তুচ্ছ লাভের আশায় আল্লাহর আয়াতগুলোকে বিক্রি করে দেয় না। তাদের জন্য তাদের প্রভুর কাছে যথযথ পুরস্কার প্রস্তুত রয়েছে। *[সুরা আলে ইমরান : ১৯৯]*

হজরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলে করিম সা. ইরশাদ করেন, তোমরা সকল প্রকার আলেমদের মজলিসে বসবে না। শুধু ওই সব আলেমের মজলিসে বসবে, যারা পাঁচটি বিষয় থেকে সরিয়ে তোমাদের অপর পাঁচটি বিষয়ের দিকে আহ্বান করে। আর এ পাঁচটি বিষয় হচ্ছে–

১. সন্দেহের অন্ধকার থেকে দূরে রেখে বিশ্বাসের আলোর দিকে আহ্বান করে, সে মজলিসে বসবে।

২. রিয়া তথা লোক দেখানো আমল ছেড়ে এখলাছ তথা একনিষ্ঠতার দিকে যদি আহ্বান করে, সে মজলিসে বসবে।

৩. দুনিয়ার লোভ-লালসা ছেড়ে যদি খোদাভীতির দিকে আহ্বান করে, সে মজলিসে বসবে।

৪. অহংকার-বড়ত্ব ছেড়ে নম্রতা অবলম্বনের দিকে যদি আহ্বান করে সে মজলিসে বসবে।

৫. শত্রুতা ছেড়ে মীমাংসা স্থাপনের দিকে।

হাদিসটিকে আবু নুআইম রহ. আল হুরিয়াতে এবং ইবনে জাওজি রহ. 'মওজুআতে' বর্ণনা করেছেন।

হজরত মাকহুল রহ. আবদুর রহমান বিন গানাম রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম.-এর দশজন সাহাবা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে একদা আমরা 'মসজিদে কুবায় এলেম অম্বেষণে ছিলাম। নবী কারিম সা. আমাদের কাছে এলেন এবং বলতে লাগলেন, 'যা শিক্ষা করার করো, কিন্তু আল্লাহ তাআলা ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের এর সওয়াব দেবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এর ওপর আমল না করো।'

হজরত ঈসা. আ. বলেন, যে ব্যক্তি এলেম অম্বেষণ করে এর ওপর আমল না করে, তার দৃষ্টান্ত ওই মহিলার মতো যে গোপনে জিনা করে গর্ভবতী হয়ে যায়। অতঃপর গর্ভ প্রকাশের ফলে সে মানুষের মাঝে লাঞ্ছিত-অপদস্থ হয়। ঠিক তেমনি যে এলেম অম্বেষণ করে এর ওপর আমল না করে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিয়ামতের দিন সব মাখলুকাতের সামনে তাকে অপদস্থ করবেন।

হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন, যখনই আলেমদের অন্তর দুনিয়ার দিকে ধাবিত হয়ে যাবে, দুনিয়াকে আখিরাতের বিপরীতে প্রাধান্য দিতে শুরু করবে, তখন আল্লাহ পাক তার থেকে হেকমতের ঝরনাগুলোকে বন্ধ করে দেবেন এবং অন্তর থেকে হেদায়াতের প্রদীপ নিভিয়ে দেবেন।

হজরত কাআব রহ. বলেন, শেষ জামানায় এমন সব আলেম তৈরি হবে, যারা দুনিয়া থেকে বিমুখ হওয়ার শিক্ষা দেবে, অথচ তারা নিজেরাই দুনিয়ার প্রাচুর্যে নিমজ্জিত থাকবে। মানুষকে আল্লাহর ভয় দেখাবে, কিন্তু নিজে আল্লাহকে ভয় করবে না। সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকদের আশপাশে না যাওয়ার জন্য মানুষকে হেদায়াত করবে, কিন্তু সে নিজে ওদের আশপাশে ঘুরবে এবং দুনিয়াকে আখিরাতের ওপর প্রাধান্য দেবে। নিজের মুখে চাপার কামাই খাবে। গরিবদের ছেড়ে ধনীদের কাছে টানবে। এলেম নিয়ে এমনভাবে গর্ববোধ করবে, যেমনভাবে পুরুষরা মহিলাদের ওপর গর্ববোধ করে থাকে। তার সমপর্যায়ের লোক অন্য কারো কাছে বসে, তখন তার গোসসা উদয় হবে।

হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন, এলেম বেশি বেশি বয়ান করার নাম নয়; বরং এলেম হচ্ছে অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হওয়ার নাম। যে ব্যাপারে ইমাম গাজালি রহ. এহইয়া উলুমুদ্দিনে বলেছেন–

> احياء علوم الدين للامام ابى حامد الغزالى رحمة الله عليه. الباب السادي فى آفات العلم وبيان علامت علماء الأخرة وعلماء السوء.
>
> হকপন্থী আলেম ও বাতিলপন্থী আলেমের ব্যাপারে ইমাম গাজালি রহ.-এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ পড়ার পর প্রত্যেককেই ভালো করে চিন্তা করা দরকার যে সে কার পেছনে দৌড়াচ্ছে, দুনিয়ার পেছনে, না আখিরাতের পেছনে? জান্নাতের উঁচু উঁচু অট্টালিকা ও নেয়ামতরাজির দিকে, নাকি জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির দিকে? পাশাপাশি হকপন্থী আলেমদের গিবত বা তাদের সমালোচনা করা থেকেও সব মুসলমানকে বেঁচে থাকতে হবে। তারা আল্লাহর খাঁটি বন্ধু। আর আল্লাহ তাআলা তার বন্ধুদের মন্দচারী অবশ্যই পছন্দ করবেন না।

টেলিভিশনের প্রতি মানুষের মনোযোগ এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে আজকাল প্রত্যেক বস্তুই সে টিভিতে তালাশ করতে চায়। হকপন্থী আলেমদের ব্যাপারেও তাদের ধারণা অনুরূপ। মনে করে যেসব আলেম টিভিতে সংবাদের ভিত্তিতে প্রসিদ্ধি লাভ করে, তারাই হকপন্থী আলেম। পক্ষান্তরে যারা মিডিয়া থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছে, তাদের কোনো গণনাই নেই। যখনই আপনি জনসাধারণের মুখে শুনবেন মৌলবি এমন এমন করে, তার ছেলেকে আমেরিকান স্কুলে পড়ায়। তখন অবশ্যই তাদের যেহেনে এমন সব আলেমই উদ্দেশ্য হয়। এদের সামনে রেখে তারা সব উলামায়ে কেরামের ব্যাপারে মন্দচারী শুরু করে দেয়। তাই ভালো করেই চিন্তা করা দরকার যে প্রত্যেক প্রসিদ্ধ আলেমের জন্যই জরুরি নয় যে সে হকপন্থী আলেমদের থেকেই হবে।

একটি ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্র ও আমর ইবনে উমাইয়া দিমারির রা.-এর অভিযান

হজরত ওয়াকিদি রা. সূত্রে বর্ণিত হজরত ইবরাহিম ইবনে আবু জাফর আবদুল ওয়াহিদ ইবনে আবু আওফ রা. থেকে বর্ণনা করে বলেন, মক্কায় আবু সুফিয়ান ইবনে হারব কুরায়শী কতগুলো লোককে একবার জড়ো করে কথাগুলো বলেছিলেন, তোমাদের মাঝে এমন কেউ কি নেই যে কূট-কৌশলে মুহাম্মদকে হত্যা করতে পারে? অথচ মুহাম্মদ তো স্বাভাবিকভাবে হাটে-বাজারে চলাফেরা করেন। তাহলে আমাদের প্রতিশোধ নেওয়া হয়ে যেত। জনৈক বেদুইন তার এ ঘোষণা শুনে তার বাড়িতে এলো। সে তাকে বলল, আপনি যদি আমার পাথেয় ও প্রয়োজনীয় বাহনের ব্যবস্থা করেন, তবে আমি মুহাম্মদের উদ্দেশ্যে বের হব এবং কূট-কৌশলে তাকে হত্যা করব। পথঘাট আমার নখদর্পণে। আমার সঙ্গে আছে শকুনের চঞ্চুর মতো একটি খঞ্জর। আবু সুফিয়ান বলল, তুমি আমাদের কাঙ্ক্ষিত বন্ধু বটে। সে তাকে একটি উট ও পর্যাপ্ত পাথেয় দিয়ে বলল, তোমার ব্যাপারটি খুবই গোপন রাখবে। কারণ আমার আশঙ্কা আছে যে কেউ এটা জানতে পারলে মুহাম্মদকে জানিয়ে দেবে। বেদুইনটি বলল, না, কেউ-ই তা জানতে পারবে না। সওয়ারিতে চড়ে সে রাতের বেলা যাত্রা করল। পাঁচ দিন পথ চলার পর ষষ্ঠ দিনের ভোরবেলায় সে ওই গোত্রের কাছে পৌঁছে গেল। এবার সে রাসুলের সন্ধান চালাতে লাগল। সে ছুটতে ছুটতে রাসুল সা.-এর নামাজের জায়গায় ঢুকলে জনৈক লোক তাকে জানায়, তিনি তো বনু আশহাল গোত্রের কাছে গেছেন। আগন্তুক তাঁর সওয়ারি ওই গোত্রের দিকে ফিরিয়ে নেয়। সেখানে গিয়ে সওয়ারি বেঁধে রাসুল সা.-এর সন্ধানে বের হয়। কিছুক্ষণ পরই রাসুলকে দেখতে পেল তিনি তখন সাহাবিদের একটি সমাবেশে কথা বলছিলেন। আসতে আসতে ভেতরে প্রবেশ করে, রাসুলও তাকে সাহাবিদের উদ্দেশ্য করে বলেন, এই লোকটির মতলব ভালো মনে হচ্ছে না। লোকটি হয়তো বিশ্বাসঘাতকতার উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে। তবে তার উদ্দেশ্য পূরণে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবেন। লোকটি দাঁড়িয়ে বলল, এখানে আবদুল মুত্তালিবের বংশধরটি কে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম নিজেই বললেন, আমিই আবদুল মুত্তালিবের বংশধর। সঙ্গে সঙ্গে সে এমন একটি ভান করল যে সে রাসুলের সঙ্গে গোপনে কোনো কথা বলবেন। কিন্তু উসায়দ ইবন হুজায়র তাকে টেনে ধরে রাসুল সা. থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চাইলে তার পায়জামার ভেতরের অংশ থেকে একটি খঞ্জর বেরিয়ে আসে। সাহাবি রাসুলের দিকে তাকিয়ে বলেন, ইয়া আল্লাহর রাসুল সা., এ তো দেখছি বিশ্বাসঘাতক দুষ্কৃতিকারী। বেদুইনটির মাথা লজ্জায় নিচু হয়ে গেল। সে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, হে মুহাম্মদ, আমাকে প্রাণে বাঁচান! আমাকে বাঁচান! সাহাবি তাকে জাপটে ধরলে রাসুল সা. বললেন, সত্যি করে বলো, তুমি কে? কি-ই বা উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছ? যদি সত্য বলো তবে তোমার লাভ হবে। আর যদি মিথ্যা বলো তবে জেনে রেখ তুমি কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছ, তা আমাদের এখন অজানা নেই। বেদুইনটি বলতে লাগল, যদি সত্যি বলি তবে কি আমার নিরাপত্তা পাব? রাসুল সা. বললেন, হ্যাঁ, তুমি নিরাপত্তা পাবে। তখন সে আবু সুফিয়ানের সব কথাই বলে দিল এবং তার সঙ্গে যা যা পাথেয় ও উপহার হিসেবে দিয়েছেন, সবই বলে দিল। এরপর রাসুল সা.-এর নির্দেশে তাকে উসায়দ ইবনে হুজায়রের তত্ত্বাবধানে আটক রাখা হয়। পরের দিন ভোরবেলা রাসুল বললেন, আমি তোমাকে নিরাপত্তা দিলাম। তোমার যেখানে মন চায় যেতে পার। তবে এর চেয়েও অধিক কল্যাণ ও মঙ্গলের একটি পথ আছে, যদি তুমি তা গ্রহণ করো! কী, গ্রহণ করবে? সে জিজ্ঞেস করে, কী সেটি? রাসুল সা. বললেন, তুমি সাক্ষ্য দেবে যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং সাক্ষ্য দেবে যে আমি আল্লাহর রাসুল। সঙ্গে সঙ্গে সেও বলে উঠল—

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّكَ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يَا مُحَمَّدُ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই
এবং হে মুহাম্মদ সা., আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসুল।

হে মুহাম্মদ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমি তো মানুষের পাশ দিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিলাম। কিন্তু যখনই আপনাকে দেখলাম আমার বুদ্ধি-বিবেক ও অনুভূতি লোপ পেয়ে গেল। আমি দুর্বল হয়ে গেলাম। পরক্ষণেই আমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ হলো। ঠিক তখনই আপনি আমার উদ্দেশ্যের কথা বলে দিলেন। অথচ অন্য কেউ আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত ছিল না।

আমি তখনই বুঝতে পেরেছি, আপনি সুরক্ষিত। আপনি সত্যের ওপর আছেন। আর আবু সুফিয়ান ও তার দলবল শয়তানের দল। তার কথা শুনে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি মুচকি হাসছিলেন। কয়েক দিন সে রাসুল সা.-এর দরবারে অবস্থানের পর অন্যত্র বের হওয়ার অনুমতি আসে, তখনই সে রাসুলের দরবার থেকে বেরিয়ে আসে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে রাসুল সা. আমর ইবনে উমাইয়া দিমারি এবং সালামা ইবনে আসলাম ইবনে হুরায়সকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, তোমরা দুজনে অভিযানে বের হও। তোমরা আবু সুফিয়ান ইবনে হারকের কাছে যাবে এবং সুযোগ পেলে তাকে হত্যা করবে। আমর (রা.) বলেন, আমি আর আমার সঙ্গী দুজনে যাত্রা করি। ইয়াজিজ নামক প্রান্তরে এসে আমরা যাত্রা বিরতি করি এবং আমাদের উট বেঁধে রাখি। আমার সঙ্গী আমাকে বলল, হে আমর, আপনি এমন মনে করেন যে এই সুযোগে আমরা মক্কায় গিয়ে সাতবার তাওয়াফ করি এবং দুই রাকাত নামাজ আদায় করি। আমি বললাম, মক্কার অধিবাসীদের আমি তোমার চেয়ে ভালো জানি। সন্ধ্যা হলে তারা ঘাস-পাতা বিছিয়ে তার মধ্যে বসে থাকে। মিশ্রবর্ণের ঘোড়াকে চেনার চেয়েও আমি মক্কা শহর বেশি চিনি। আমার সঙ্গী তার কথায় অটল থেকে আমার কথা শুনল না। আমরা যাত্রা করে মক্কায় পৌঁছে বায়তুল্লাহ শরিফে সাতবার তাওয়াফ করি। দুই রাকাত নামাজও আদায় করি। সেখান থেকে বের হওয়ার পর আবু সুফিয়ানের পুত্র মুআবিয়ার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে যায়। সে আমাকে চিনে নিয়ে বলল, হে আমর ইবনে উমাইয়া, তোমার জন্য দুঃখ হয়! বলে একটি সতর্ক বার্তা বলে দিল যে আমরের মতলব ভালো নয়।

জাহেলি যুগে আমর বেপরোয়া ও লড়াকু প্রকৃতির ছিলেন বটে। মুআবিয়ার ডাক শুনে মক্কাবাসী বেরিয়ে এলো এবং এক জায়গায় জড়ো হলো। এদিকে ওদের অবস্থা দেখে আমর ও সালামা (রা.) দুজনে পালিয়ে গেলেন। ওরা তাদের খোঁজে বের হলো। পাহাড়ে পাহাড়ে তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগল। আমর বলেন, আমি দ্রুতবেগে একটি গুহায় ঢুকে তাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে যাই। কিন্তু মদিনার পথ তাদের জন্য আল্লাহর রহমতে অজ্ঞাত ছিল। তারা তন্নতন্ন করে আমাদের খোঁজে বেড়ায়। আমরা তাদের দৃষ্টির আড়ালেই ভোর পর্যন্ত সেখানে থেকে পরদিন পূর্বাহ্নে ওসমান ইবনে মালিককে দেখতে পাই ঘোড়ার জন্য ঘাস সংগ্রহ করতে। আমার সঙ্গী সালামা ইবনে আসলামকে আমি বলি, যদি আমরা তার দৃষ্টিতে পড়ি, তবে সে আমাদের কথা জানিয়ে দিতে পারে। এখন তো ওরা আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। ঘাস সংগ্রহ করতে করতে ওসমান আমাদের গুহার

একেবারে কাছে চলে আসে। আমি গুহা থেকে বের হয়ে তার বুকে খঞ্জর বসিয়ে দিই। সঙ্গে সঙ্গে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং আর্তনাদ করতে থাকে। মক্কাবাসী চারদিকে চলে গিয়েছিল। তার চিৎকার শুনে সবাই সেখানে একত্র হলো। আমি গুহায় লুকিয়ে রইলাম। আমার সঙ্গীকে বললাম, খবরদার, একটুও নড়াচড়া করবে না। ওরা সবাই ওসমানের কাছে এলো এবং তাকে আঘাত করেছে কে, এটি জিজ্ঞেস করলে বলল, আমর ইবনে উমাইয়া দিনমারি। আবু সুফিয়ান মন্তব্য করল, আমি আগেই বলেছি, সে কোনো ভালো মতলবে মক্কায় আসেনি। ওসমানের তখন মুমূর্ষু অবস্থা, তাই সে আমাদের অবস্থান ওদের জানাতে পারেনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। ওকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় তারা আমাদের খোঁজে মনোযোগ দিতে পারেনি। ওরা তাকে তুলে নিয়ে গেল। ওই জায়গায় আমরা দুই রাত অবস্থান করি। আমাদের খোঁজার চাঞ্চল্য যখন স্তিমিত হয়ে পড়ল, তখন আমরা ওই গুহা ছেড়ে তানঈম গিয়ে পৌঁছলাম। আমার সঙ্গী আমাকে বলল, আচ্ছা, আমরা যদি হজরত খুবায়বের হত্যাকাণ্ডের স্থানে যাই এবং তাঁর শূলের কাষ্ঠ থেকে তাঁকে নামিয়ে আনি, তাহলে কেমন হয়? আমি বললাম, খুবায়ব (রা.) এখন কোথায়? সে বলল, তিনি তো শুলিবিদ্ধ অবস্থায় রয়েছেন। শত্রুপক্ষের প্রহরীরা তাঁর লাশ পাহারা দিয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম, তুমি আমাকে একাকী যাওয়ার সুযোগ দাও! তুমি দূরে সরে থেকো। শত্রুপক্ষের আশঙ্কা সৃষ্টি হলে তুমি তোমার উটে চড়ে সোজা মদিনায় রাসুল সা.-এর কাছে ফিরে যাবে এবং আমাদের সব সংবাদ তাকে অবহিত করবে। আমার ব্যাপারে মাথা ঘামাবে না। কারণ মদিনার পথ-ঘাট আমার চেনা আছে। আমি খুবায়বের (রা.) লাশ খুঁজতে লাগলাম। একপর্যায়ে তা পেয়েও গেলাম। সুযোগ বুঝে তাঁকে পিঠে তুলে নিলাম। ২০ হাতের মতো পথ চলার পর প্রহরীরা ঘুম থেকে জেগে গিয়ে আমাকে ধরার জন্য পদচিহ্ন অনুসরণ করতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে কাঠসহ হজরত খুবায়ব (রা.)-এর লাশ মাটিতে রেখে পায়ে মাটি টেনে তা ঢেকে দিতে লাগলাম। তখন ওই কাঠ থেকে একটি শব্দ বের হয়েছিল। ওই শব্দ আমি এখনো ভুলতে পারি না। তাঁকে মাটি চাপা দিয়ে সাফরার পথে অগ্রসর হলাম। ওরা আমার নাগাল পেতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল। আমি জীবিত ছিলাম বটে; কিন্তু তখন আমার দেহে কোনো অনুভূতি ছিল না। আমার সঙ্গী সালামা ইবনে আসলাম তাঁর উটে চড়ে রাসুল সা.-এর কাছে সব ঘটনা খুলে বলেন। আমি মদিনার পথে অগ্রসর হয়ে যাজনান গোত্রের মরূদ্যানের কাছে একটি গুহায় আশ্রয় নিলে বানু দায়ল ইবনে বকর গোত্রের একজন দীর্ঘদেহি টেঁরা চোখা লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায়। আমার সঙ্গে ছিল ধনুক-তীর আর খঞ্জর। সে টেরা চোখা লোকটি আমাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? আমি

বললাম, আমি বনু বকর গোত্রের লোক। সে বলল, আমিও বকর গোত্রের লোক। এরপর সে হেলান দিয়ে মনের সুখে নিম্মোক্ত কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল–

فَلَسْتُ بِمُسْلِمٍ مَادُمْتُ حَيًّا - وَلَسْتُ اَدِيْنُ دِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَا

আমি মুসলমান নই। যত দিন বেঁচে থাকি মুসলমান হবো না। আমি মুসলমানদের ধর্ম মানি না।

আমি মনে মনে বললাম, আমি তো তোমাকে খুন করব। সে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি তাকে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করলাম। আমি গুহা থেকে বেরিয়ে পথে নেমে এলাম। আমার সঙ্গে কুরায়শদের প্রেরিত দুজন গুপ্তচরের দেখা হয়। ওদের উদ্দেশ্যে আমি বললাম, তোমরা দুজনে আত্মসমর্পণ করো। ওদের একজন তা মেনে নিতে অস্বীকার করল। আমি তৎক্ষণাৎ তীর নিক্ষেপে তাকে হত্যা করলাম। এটি দেখে অন্যজন আত্মসমর্পণ করল। আমি ভালোভাবে তাকে বেঁধে রাসুল সা.-এর উদ্দেশ্যে রওয়া দিলাম। যখন মদিনায় পৌছি, তখন খেলাধুলায় মগ্ন আনসারি শিশুরা আমার কাছে এসে জড়ো হয়। যখন বয়স্ক লোকদের থেকে তারা শুনল যে 'এই আমর' 'এই আমর' তখন শিশুরা দৌড়ে গিয়ে রাসুল সা.কে সংবাদ দিল যে হুজুর, আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি তাকে। যখন সে আমার ধনুকে ছিলা দ্বারা মজবুত করে বাধা ছিল। রাসুল সা.-এর দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি হাসছেন। তারপর তিনি আমার জন্য দোয়া করলেন। আমর (রা.) মদিনায় পৌছার তিন দিন আগে সালামা ইবনে আসলাম সেখানে পৌছে গিয়েছিলেন। বায়হাকি (রহ.) এটি বর্ণনা করেছেন। *[আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : খণ্ড ৪ : পৃ. ১৪১]*

পূর্ব থেকে কালো পতাকার আগমন ও তার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বর্তমান বিশ্বে যে লাড়াইগুলো চলছে তার মূলকেন্দ্র হলো আফগানিস্তান। ওসামা বিন লাদেনের অনুসরণে আল-কায়েদা নেতারা মোল্লা ওমরকে আনুগত্যের শপথ (বাইয়াত) দিয়েছেন। আল-কায়েদা ও তালিবানের মধ্যে যে স্বতন্ত্রতা ছিল, তা দূর হয়ে যেতে লাগল এবং তালিবানের নতুন প্রজম্ম বৈশ্বিক সংগ্রামের জন্য আল-কায়েদার কাছে তাদের আনুগত্যের শপথ দিল। তারা সবাই একই পতাকার নিচে একটি কালো পতাকা, যেখানে আরবিতে লেখা আছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই)। এই ট্রেন্ড শুধু আফগানিস্তানে

সীমাবদ্ধ নয়; বরং আল-কায়েদার সঙ্গে সম্পৃক্ত সব দলের একটি কালো পতাকা আছে, যাতে শাহাদাহ বাক্য লেখা রয়েছে।

প্রসঙ্গ কথা : কালো ও সাদা উভয় পতাকাই রাসুল সা. যুদ্ধ ক্ষেত্রে মুসলিম আর্মিকে একটি কেন্দ্রীয় কম্যান্ডের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে যুদ্ধের মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। পরবর্তী ইসলামিক প্রজম্মগুলোও কালো ও সাদা পতাকার ব্যবহার চালু রাখে। সেই সৈন্যবাহিনীর অনুকরণে যাদের ব্যাপারে হাদিসে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আব্বাসিরা এটা করার চেষ্টা করেছিল এবং তাদের প্রথম দিকের খলিফাগুলোর কোনো একজনকে মাহদি বলে সম্বোধন করতেন। মুসলিমদের সেই বহু প্রতীক্ষিত নেতা যিনি মুসলিমদের বিজয়ের দিকে নিয়ে যাবে।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস : ১৯২৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে খিলাফার পতন ঘটল এবং সহজেই 'বিভাজন এবং জয় সূত্র' (Divide and Conquer Rule) বাস্তবায়নের জন্য একত্রে যুক্ত থাকা মুসলিম রাষ্ট্র বিভক্ত করে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হলো। প্রত্যেক রাষ্ট্রের জন্য বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন পতাকা নির্ধারণ করা হলো এবং দালাল শাসকদের চাপিয়ে দেওয়া হলো, যারা সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থন করে। কিন্তু তাদের কেউই সেই কালো পতাকা বহন করে না। সেই কালো পতাকা পুনরায় ফিরে এলো যেমনভাবে রাসুল সা. যুদ্ধের সময় সেই পতাকা আবির্ভূত করতেন।

কালো পতাকার ভবিষ্যদ্বাণী

হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সা. বলেছেন যে খোরাসান থেকে কালো পতাকাধারী লোক বের হবে, যাদের কেউ পরাজিত করতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা আলিয়ায় বিজয় পতাকা ওড়াবে। *[মুসনাদে আহমদ]*

'আলিয়া'-এর পরিচয় : আলিয়া হলো বাইতুল মাকদিসের প্রাচীন রোমান নাম। তৎকালীন খোরাসান ছিল। বর্তমান আফগান ও পূর্বে ইরান।

ইসলামে কালো পতাকাবাহী সেনাবাহিনীর বর্ণনা

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে হাওয়ালাহা রা. থেকে বর্ণিত তিনি রাসুল সা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, পরিস্থিতি তার কাজের ধারা অনুযায়ী চলতে থাকবে যতক্ষণ না তোমরা তিনটি বাহিনীতে পরিণত হও; একটি বাহিনী শামের

এবং একটি বাহিনী ইয়েমেনের, আর আরেকটি বাহিনী ইরাকের। 'ইবনে হাওয়ালাহ রা. আবার রাসুল সা.কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল সা., যদি আমি সেই দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তবে আমার জন্য একটি নির্ধারণ করে দিন।' আল্লাহর রাসুল সা. উত্তর দিলেন, তোমার শামে যাওয়া উচিত হবে। কারণ এটি আল্লাহর ভূমিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম এবং উনার সবচেয়ে ভালো বান্দারাই সেখানে জড়ো হবে। আর যদি তুমি তা না চাও, তবে তোমার ইয়েমেনে যাওয়া উচিত এবং সেখানকার কূপ থেকে পানি পান করা উচিত। কারণ আল্লাহ আমাকে নিশ্চিত করেছেন যে উনি শাম ও তার মানুষের ওপর খেয়াল রাখবেন। হাদিস অনুসারে তিনটি সেনাবাহিনী তৈরি হবে। যার মধ্যে একটি সেনাবাহিনী। ১. শামে, ২. ইরাকে, ৩. ইয়েমেনে। অপরটি খোরাসানে (আফগানিস্তান ও তার চারপাশে) যদিও এই ব্যাপারে মতানৈক্য আছে, পৃথিবীর সবাই এই বাস্তবতা অনুভব করছে। *[ইমাম আহমেদ রহ. মুসনাদে আহমেদে বর্ণনা করেছেন : ৪/১১০ : আবু দাউদ : ২৪৮৩]*

ইবনে মাজায় বর্ণিত হয়েছে যে এরপর খোরাসান থেকে কালো পতাকা বের হয়ে আসবে এবং এমনভাবে তোমাদের হত্যা করবে যে কখনো এভাবে হত্যা করা হয়নি...সুতরাং যখন তোমরা তাঁকে (ইমাম মাহদিকে) দেখবে, তখন তাদের কাছে যাবে এবং তাঁকে বাইয়াত (আনুগত্যের শপথ) দেবে, এমনকি যদি এটা করার জন্য তোমাদের বরফের ওপর হামাগুঁড়ি দিয়েও যেতে হয়। নিশ্চয়ই মাহদি হলো আল্লাহর খলিফা। *[ইবনে মাজাহ (ইন্টারনেট সূত্রে Black Flags From The East, Black Banners Come Out of Khurasan Nathing Will Stop Them. Until They Are Raised In Jerusalem থেকে নেওয়া)]*

আল্লাহ তাআলা বলেন–

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا . عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا.

তোমরা যদি ভালো করো, তবে নিজেদেরই ভালো করবে এবং যদি মন্দ করো তবে তাও নিজেদের জন্যই। এরপর যখন দ্বিতীয় সে সময়টি এলো, তখন অন্য বান্দাদের প্রেরণ করলাম, যাতে তোমাদের মুখমণ্ডল বিকৃত করে দেয়, আর

মসজিদে ঢুকে পড়ে যেমন প্রথমবার ঢুকেছিল এবং যেখানেই জয়ী হয়, সেখানেই পুরোপুরি ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। হয়তো তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। কিন্তু যদি পুনরায় তদ্রূপ করো, আমিও পুনরায় তাই করব। আমি জাহান্নামকে কাফেরদের জন্য কয়েদখানা করেছি। *[সুরা বনী ইসরায়েল : ৭-৮]*

وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের ওয়াদা দিয়েছেন যে তাদের অবশ্যই পৃথিবীতে খিলাফত দান করবেন। যেমন তিনি খেলাফত দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদের শান্তি দান করবেন। তারা আমার এবাদত করবে এবং আমার সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য। *[সুরা আন নূর : ৫৫]*

মহানবী সা.-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী ও স্বপ্ন ব্যাখ্যায় হযরত ইউসুফ (আ.)

মিসরের রাজা স্বপ্ন দেখলেন। হযরত ইউসুফ (আ.) তার ব্যাখ্যা দিলেন, তোমরা সাত বছর দুর্ভিক্ষের কবলে থাকবে। ব্যাখ্যার সঙ্গে তিনি সেই দুর্ভিক্ষ মোকাবেলার পন্থা-পরিকল্পনাও বলে দিলেন। মিসরের রাজা সে মোতাবেক কাজ করে আপন প্রজাদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করলেন।

এই উম্মতের মহান নেতা মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চৌদ্দশো বছর আগে সংবাদ দিয়ে গেছেন, দেখো, অমুক-অমুক মুসলিম রাষ্ট্রের উপর দিয়ে এই-এই বিপদ বয়ে যাবে। কাজেই তোমরা আগে থেকেই পরিকল্পনা ঠিক করে রাখো। কিন্তু মুসলমান তাদের নবীর কথায় কোনোই কর্ণপাত করছে না।

বরং বিষয়টি তাকদীরে লিখন মনে করে গাফলতের ঘুম ঘুমিয়ে আছে। অথচ আজ যদি পশ্চিমা মিডিয়া ঘোষণা করে, অমুক দেশে সুনামি হতে যাচ্ছে কিংবা অমুক শহর ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে যাবে, ফলে মানুষ যেন চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে শহর ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়। তখন আপনি চব্বিশ ঘন্টা পর সেখানে একটা কুকুর বিড়ালও খুঁজে পবেন না। তখন মানুষ মৃত্যু থেকে নিজেকে রক্ষা করতে এমনভাবে পলায়ন করবে, যেন অবধারিত মৃত্যুকেও এড়ানো সম্ভব।

বাস্তবিক পক্ষে এর কারণ কি যে, বিশ্বনবীর সতর্কবাণী শোনার পরও মুসলমানদের মাঝে কোনো জাগরণ সৃষ্টি হচ্ছে না?

স মা প্ত

cover design : ha mim kefayat

বড়দের স্মরণে

Boroder Shorone

Maulana Asim Umar

ISBN : 984 70168 0097 0